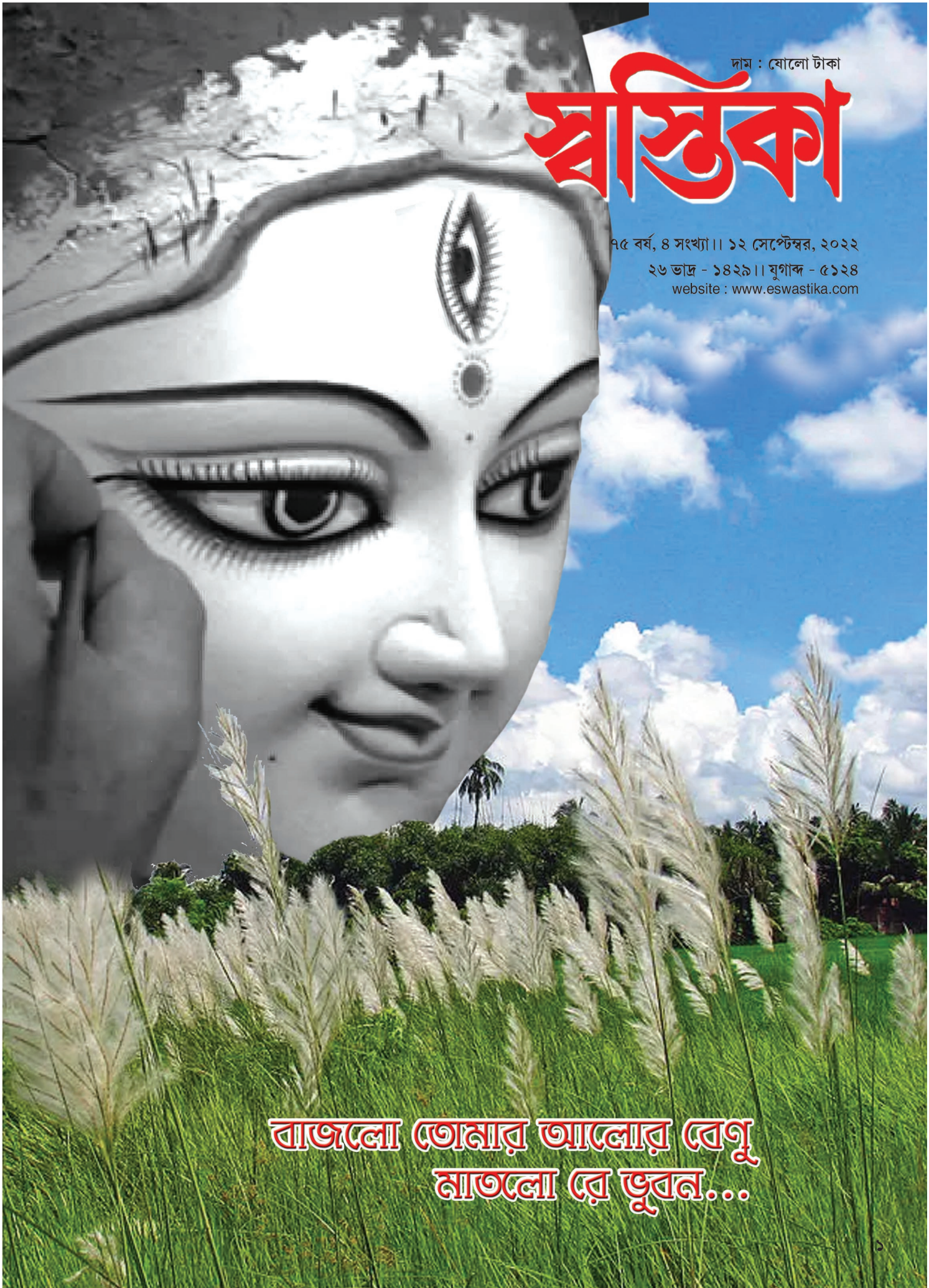

দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৫ বর্ষ, ৪ সংখ্যা।। ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২২
২৬ ভাদ্র - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪
website : www.eswastika.com

বাজলো তোমার আলোর বেণু
মাতলো রে ভুবন...

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ৪ সংখ্যা, ২৬ ভাদ্র, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

১২ সেপ্টেম্বর - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

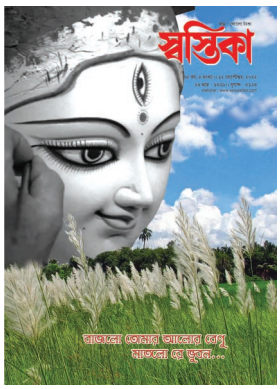

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

বহুরূপী মমতাতেই লুকিয়ে রয়েছে তৃণমূলের সব দুর্নীতি ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

সব আঙুল কি সমান হয়? ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

করোনার আগের অর্থনীতির অগ্রগতি আবার ফিরে এসেছে ☐ সৌম্যকান্তি ঘোষ ☐ ৮

হাসিনার সফরের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত-বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্ক কোন পথে? ☐ বিশ্বামিত্র ☐ ১০

সাবেক বাঙ্গালিয়ানা থেকে দূরে সরে গেছে কলকাতা ☐ অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায় ☐ ১১

পনেরো হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা ☐ সন্দীপ চক্রবর্তী ☐ ১৩

মাতৃভাষা ও উপভাষা, বিশের প্রেরণা ☐ বর্ণিক চ্যাটার্জি ☐ ১৭

স্মৃতিতে মহিষাসুরমর্দিনী ☐ নন্দলাল ভট্টাচার্য ☐ ২৩

রেডিয়োয় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ মানে উমা আসছে ☐ নিখিল চিত্রকর ☐ ২৫

মা মনসা লৌকিক দেবী ☐ মিলন খামারিয়া ☐ ৩১

সাংখ্য দর্শনের মূল কথা আমিত্বের বিসর্জনেই ত্রিতাপের অবসান ☐ কৃষ্ণচন্দ্র দে ☐ ৩৩

অযোধ্যার মারীচি মায়ের মন্দির ☐ দেবাশিস চৌধুরী ☐ ৩৪

সে ছিল একদিন আমাদের... ☐ সুজিত রায় ☐ ৩৫

শুধু হাজতবাস নয়, কেষ্টদের জনবিচ্ছিন্ন করাও দরকার ☐ সুপ্রভাত বটব্যাল ☐ ৩৬

বিনা রক্তপাতে বিশ্বজয়ের কাহিনি ☐ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ☐ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ☐ অঙ্গনা : ২১ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐ সমাবেশ সমাচার : ২৮-৩০ ☐ খেলা : ৩৮ ☐ অন্যরকম : ৩৯ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৮ ☐ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে
১৯ সেপ্টেম্বর
২০২২

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৯ সেপ্টেম্বর
২০২২

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

পূজা সংখ্যা ১৪২৯

বাঙ্গালির আশ্বিন মাস মানে আকাশে-বাতাসে ছুটির নিমন্ত্রণ। রোদ্দুরে সোনালি আভা। বাঙ্গালির কাছে আশ্বিন হলো মধুমাস। কারণ, এই আশ্বিনে মা আসেন। বাঙ্গালির আলোআঁধারি জীবনে আশার প্রদীপ জ্বেলে দেন। স্বস্তিকা মা দুর্গাকে বরণ করে বিশেষ পুজোসংখ্যা প্রকাশ করে। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত হবে স্বস্তিকার পূজা সংখ্যা। স্বস্তিকার লেখক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, বিক্রয় প্রতিনিধি ও শুভানুধ্যায়ীদের দুর্গা পুজোর আগাম অভিনন্দন।

দাম সত্তর টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

With Best Compliments from :-

A

Well Wisher

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

মহালয়া মাতৃবোধনের প্রস্তুতিপর্ব

ভারতবর্ষের প্রাণভ্রমর হইল ধর্ম। এই প্রমাণিত সত্যকে বারবার মহাপুরুষগণ আমাদিগকে স্মরণ করাইয়াছেন। এই বিশাল দেশে নানাবিধ ভাষা,সামাজিক রীতিনীতির বৈচিত্র্য ও ভৌগোলিক বিশালত্ব সত্ত্বেও ভারতবর্ষীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি এই দেশকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া এক মহা সমন্বয় সাধন করিয়াছে। তাহা যুগ যুগ ধরিয়া ভারতীয় সমাজজীবনে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। এই ঐক্য ও সমন্বয়ই হইল ভারতবর্ষীয় জীবনের প্রধানতম সুর। এই সুর কোনো রাজনৈতিক বা গোষ্ঠীগত নহে—ইহা সমগ্র ভারতবাসীর অন্তরমথিত সমন্বয়ের সুর। এই সুর বিশেষভাবে ঝংকৃত হইয়া উঠে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে, পালা পার্বণে। মহালয়ার পিতৃতর্পণের দিনটিতে ভারতবাসীর একরূপতার এই চিত্রটি বিশ্ববাসীর নিকট প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। পূর্ব হইতে পশ্চিম, উত্তর হইতে দক্ষিণ বিভিন্ন নদ-নদী বা জলাশয়ে কোটি কোটি ভারতবাসী পিতৃতর্পণ অর্থাৎ পরলোকগত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে জলদান করিয়া থাকেন। মহৎ কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে বলিয়া এই পবিত্র দিনটি মহালয়া বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ইহা পিতৃপক্ষের শেষদিন। লোকবিশ্বাস যে, পরলোকগত পূর্বপুরুষগণ তাঁদের বংশধরদের দর্শন করিবার নিমিত্ত বিগত চৌদ্দদিন ধরিয়া মর্ত্যলোকে অবস্থান করিয়া মহালয়ার দিনে তাঁহাদের বংশধরদের প্রদত্ত জল গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হইয়া স্বর্গলোকে প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকেন। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি যে বিশ্বজনীন তাহা বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ ছাড়াও মহালয়ার পিতৃতর্পণ মন্ত্রের মধ্যেও নিহিত রহিয়াছে। তর্পণকারী প্রতিটি হিন্দু 'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাদিদমস্তু তিলোদকং' মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে তাঁহাদের পূর্বপুরুষদিগকে জলদান করিবার সময় ত্রিভুবনের সমস্ত প্রয়াতদের উদ্দেশেও জলদান করিয়া থাকেন। যাঁহাদের সন্তানসন্ততি, আত্মীয় বান্ধব কেহই নাই, তাঁহাদেরও জলদানে তৃপ্ত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে মহালয়া হইল পুর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের দিন। এই শ্রদ্ধা ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিশ্বজনীনতা প্রদান করিয়াছে। ভারতীয় ঋষিগণ শ্রদ্ধার দ্বারা অর্জিত জ্ঞানে শুধুমাত্র ভারতবর্ষকে সমৃদ্ধ করেন নাই, সমগ্র বিশ্বকেও তাহা অকাতরে দান করিয়াছেন।

পূর্বপুরুষদিগের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন শুধুমাত্র ভারতবর্ষীয়দের মধ্যেই সীমিত নহে। প্রাচীন রোমানরা নয়দিন ধরিয়া পারেন্তালিয়া উদ্‌যাপনের মাধ্যমে তাহাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেন। প্রাচীন মিশরীয়দের মৃতের প্রতি শ্রদ্ধার কথা সমগ্র বিশ্বে কিংবদন্তী হইয়া রহিয়াছে। ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা নভেম্বর মাসে 'অল সোল্‌স ডে' পালন করিয়া মৃতদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। মেক্সিকোর খ্রিস্টানরা তাহাদের মৃতদের প্রতি সম্মান জানাইবার জন্য বিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করিয়া থাকে। ফিলিপিনস ও মায়ানমারের অধিবাসীরা হলোমাস উৎসবের মাধ্যমে মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়া থাকেন। ভারতবর্ষীয়দের নিকট মহালয়া দিনটি আরও একটি কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাহা হইল এই তিথিতেই মা দুর্গার আগমনবার্তা ঘোষিত হয়। দেবীর বোধন শুরু হয়। মহালয়ায় পিতৃতর্পণের সঙ্গেই আকাশ বাতাস মথিত করিয়া ধ্বনিত হইতে থাকে চণ্ডীপাঠের সুর। বহু দশক ধরিয়া আকাশবাণী হইতে সম্প্রচারিত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে চণ্ডীস্তোত্র উচ্চারণ আপামর বাঙ্গালিকে স্মৃতিমেদুর করিয়া তোলে। চণ্ডীপাঠের সুরে মা আসিবার পূর্বাভাসটি প্রকট হইয়া ওঠে বাঙ্গালির মনে-প্রাণে। সংবৎসরের অভাব অভিযোগের মধ্যেও দেবীর আগমনবার্তা বাঙ্গালি জীবনে লইয়া আসে অপার আনন্দ। মহালয়ার প্রায় পক্ষকাল পূর্ব হইতেই বাঙ্গালি তাহার পিতৃপুরুষদের স্মরণ মনন করিয়া, তাঁহদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়া, শুদ্ধ অন্তরে মাতৃআরাধনার জন্য প্রস্তুত হন। আড়ম্বরের আস্ফালনে নয়, শ্রদ্ধাবনত চিত্তে আবাহন করিলেই মা তাঁহার সন্তানদের কৃপা বর্ষণ করেন। তাই নিশ্চিতভাবে মহালয়া মাতৃবোধনের প্রস্তুতিপর্ব।

সুভাষিতম্

নাস্তি গ্রামঃ কুতঃ সীমা নাস্তি বিদ্যা কুতো যশঃ।

নাস্তি জ্ঞানং কুতো মুক্তির্ভক্তির্নাস্তি কুতস্থু ধীঃ।।

যদি গ্রাম না থাকে তাহলে সীমানা কীকরে থাকবে? যদি শিক্ষা না থাকে, যশ কীকরে আসবে? যদি জ্ঞান না থাকে, মুক্তি কীকরে আসবে? আর যদি ভক্তি না থাকে, বুদ্ধি কীকরে থাকবে?

বহুরূপী মমতাতেই লুকিয়ে রয়েছে তৃণমূলের সব দুর্নীতি

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

অনেকে বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক কাদার বাঁশ বা হাওয়া মোরগ। যেদিকে ঠেলবেন বা ঘুরবে তিনি সেদিকে যাবেন। যখন যেমন তখন তেমন মমতার নীতি আর দুর্নীতি। সংসদে বা রাজ্য বিধানসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী আসনে বসেননি। চারবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েও কোনো কার্যকাল শেষ করেননি। দপ্তরহীন মন্ত্রী থেকেও মমতা শাসকের হাত ছাড়েননি। নরসিংহ রাও জমানায় তাঁর কাছে গান্ধী পরিবার ভালো আর রাও খারাপ ছিল। অটলবিহারী বাজপেয়ী জমানায় মমতার কাছে বাজপেয়ী ভালো ছিল আর লালকৃষ্ণ আদবানি খারাপ। আবার নরেন্দ্র মোদী জমানায় প্রথম দিকে আদবানি ভালো ছিল আর মোদী খারাপ। এখন তাঁর নতুন রাজনৈতিক লাইন নরেন্দ্র মোদী ভালো আর অমিত শাহ খারাপ।

দুর্নীতিতে ডুবে যাওয়া তৃণমূলকে নতুন রাজনৈতিক লাইন দেখাতে মমতাকে বেশ বেগ পেতে হবে। অমিত শাহর পুত্র জয় শাহকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অযাচিত আর অনাবশ্যক আক্রমণ তার প্রমাণ। গলাবাজি বা চীৎকার করে আর দুর্নীতি বিরোধী মুখোশের আড়ালে থেকে কোনো ভাবেই অন্যায় চাপা দেওয়া যাবে না। সাক্ষী হিসেবে অভিষেককে জেরা করছে ইডি। তৃণমূল নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাক্ষী হিসেবে ডেকে গ্রেপ্তার করেছিল সিবিআই। দলের মধ্যে সুদীপবাবু অভিষেক বিরোধী। যেমন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম আর সুব্রত বক্সী।

বাতিল হয়ে যাওয়া বৃদ্ধ তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়কে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাতে ভরাডুবি বাঁচবে বলে মনে হয় না। শোনা যাচ্ছে রাজনৈতিকভাবে অদক্ষ আমলা সাংসদ জহর সরকার দল ছাড়বেন। কারণ দলের দুর্নীতি। উচ্চাকাঙ্ক্ষী জহরবাবু

গ্রেপ্তারি মেমোতে মমতার নাম নিয়ে পার্থবাবু মমতাকে খানিকটা বেকায়দায় ফেলেছেন। এভাবে কতদিন সজীব থাকবেন মমতা? বহুরূপী মমতার আসল রূপ প্রকাশ পেতে খুব দেরি হবে বলে মনে হয় না।

তৃণমূলে বেমানান ছিলেন। তাঁকে আটকাতে অভিষেকের আস্থাভাজন সুখেন্দুশেখর রায়কে আসরে নামানো হয়েছে। জহরবাবুর জায়গা নিতে মমতা বিরোধী এক আইনজীবী আবার সজীব হয়ে মমতার নৌকোতে নতুন করে সওয়ার হতে চাইছেন।

রাজনৈতিক লুকোচুরিতে চিরকাল পটু মমতা। নাম দিয়েছি 'মেঘনাদ মমতা'। নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক অবস্থান না থাকায় মমতা ভাষাকে ইচ্ছাকৃত জটিল করেন। অবস্থা বুঝে অন্যের প্রশংসা আর নিন্দা করেন। গুরুত্ব মেপে রাজনীতির ঠাকুরপুজো করেন। মমতার প্রশংসা আর তিরস্কারকে গুরুত্ব দেওয়া মূর্খামি। বন্ধু বা বিরোধী উভয়ের চোখে ঠুলি পড়াতে পারেন মমতা। ভ্রম তৈরি করতে পারেন যাতে তাঁকে চেনা না যায়। ২০১৮ সালের কর্মীসভায় বলেছিলেন তৃণমূল যুব কংগ্রেস 'মাদার তৃণমূলের' অংশ। চার বছর পর ছেলেখেলা করে একজন অভিনেত্রীকে যুব সভাপতি করা হয়েছে। তৃণমূল গিয়েছে অভিষেকের দখলে। দল চালানোর জন্য ২৫ শতাংশ টাকা নিজে খরচ করুন আর ৭৫ শতাংশ দলকে দিন বলে নিদান হেঁকেছিলেন মমতা। সেই সুযোগে পার্থ চট্টোপাধ্যায় আর অনুব্রত মণ্ডল ১০০ শতাংশ বেআইনি সম্পত্তি বানিয়ে নিয়েছেন। হাস্যকরভাবে বলা হচ্ছে মমতা জানতেন না। তাহলে মমতার পদত্যাগ করা উচিত, কারণ দলে তাঁর নিয়ন্ত্রণ নেই। জনমানসে প্রশ্ন উঠেছে, 'কার পাপে' ডুবছে তৃণমূল?

মমতার রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে বহুদিন থেকেই বিতর্ক রয়েছে। তৃণমূলের নেতারা দাবি করছেন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে মমতা 'একলা চল রে' নীতি নেবেন। মমতা ভাবেন একরকম। বলেন আর একরকম। করেন অন্যরকম। তাই তাঁকে বাদ দিয়ে তৃণমূলের নীতি বা দুর্নীতি প্রমাণ হয় না। পার্থ চট্টোপাধ্যায় দলের মহাসচিব ছিলেন। অনুব্রত মণ্ডল মাস্‌লম্যান। মানুষকে ভয় দেখিয়ে অর্থ জোগাড় করতেন আর বেআইনি পথে নিজের সম্পত্তি বানাতেন। দুটোই বেআইনি। পার্থবাবু সাসপেন্ড হয়েছেন আর মমতা অনুব্রতকে ঘুরিয়ে সমর্থন করেছেন। দুজনেই মমতার পৃষ্ঠপোষকতায় বেড়ে উঠেছিল। তদন্ত সংস্থার কাছে দু'জনের কেউ মমতার বিরুদ্ধে মুখ খোলেননি। তবে গ্রেপ্তারি মেমোতে মমতার নাম নিয়ে পার্থবাবু মমতাকে খানিকটা বেকায়দায় ফেলেছেন। এভাবে কতদিন সজীব থাকবেন মমতা? বহুরূপী মমতার আসল রূপ প্রকাশ পেতে খুব দেরি হবে বলে মনে হয় না। সেটা কী? সেটাই দেখার। □

সব আঙুল কি সমান হয় ?

জ্ঞানদাত্রীষু দিদি,

মন দিয়ে শুনেছি। লোভ আসলে ব্যক্তিনির্ভর। কেউ ভালো হবেন না খারাপ, লোভ করবেন বা করবেন না, সেটা তাঁর উপরেই নির্ভর করে। অন্য কারও উপর নয়। আপনি বলছিলেন। টিভিতে দেখছিলাম শিক্ষক দিবসের সরকারি অনুষ্ঠান। দারুণ লাগছিল দিদি। আসলে দিদি আপনি কীসের লোভের কথা বলছিলেন সেটা বুঝিনি। ক্ষমতার লোভও তো লোভ। যখন যাকে দরকার তার হাত ধরা এবং কাজ মিটে গেলে ছেড়ে দেওয়াও কি লোভ? না, দিদি, খোঁচা নয় কৌতূহল থেকে জিজ্ঞেস করছি।

আপনার অন্য কথাও মন দিয়ে শুনেছি। কিন্তু বিশ্ব বাংলা মেলাপ্রাঙ্গণে 'শিক্ষারত্ন' সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানে ওই কথাগুলোই সেরা। আপনি বলেছিলেন, 'আমি কত টাকার মালিক হলাম, সেটা আমার পরিচয় নয়। পয়সা আজ আছে, কাল উড়ে যাবে। আমি কতটা লোভী হব, কতটা ভালো ভাবে চলব, তা আসলে নির্ভর করে আমার উপর। কতটা খারাপ হব, নির্ভর করে আমার উপর।' এর পরেই আপনি বলেছেন, 'আমার পাঁচটা আঙুল এক নয়। একটা রোগা, একটা মোটা, একটা বেঁটে। সমাজে ভালোও আছে, খারাপও আছে। একটা মানুষ কী একটা খারাপ ব্যবহার করল, তার জন্য পুরো সমাজকে কুৎসা করে উড়িয়ে দিলাম, সবাইকে খারাপ বললাম, কুৎসা করলাম, এটা ঠিক নয়।'

একদম ঠিক কথা বলছেন। হাতের সব আঙুল যেমন সমান নয় তেমন সবাইকে সৎ হতে হবে তার কি মানে আছে। পার্থর বান্ধবীর থেকে টাকা পাওয়া গিয়েছে, বিপুল সম্পত্তি পাওয়া গিয়েছে, কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতন এমনকী রাজ্যের বাইরেও অনেক ফ্ল্যাট পাওয়া গিয়েছে। তাতে কী হয়েছে! কেষ্টর অনেক সম্পত্তি। এর ওর নামেও অনেক সম্পত্তি তাতে কী হয়েছে। ববির প্রচুর সম্পত্তি, ভাইপোর রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ি, সব মন্ত্রীদেরই সম্পত্তি বেড়েই চলেছে, বেড়েই চলেছে। মানে সব আঙুলই তো সমান। এই রে ভুল বলে ফেললাম। সব আঙুল মানে, ভাই দেখা যাচ্ছে সমান সমান।

ওই বক্তৃতায় আপনি এমনও বলেছেন যে, 'আপনি যদি আমাকে বলেন, ১০০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন? ভগবানও কি ১০০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন? আমি কে? আমি একজন সাধারণ মানুষ!' কিন্তু দিদি, আপনি তো এতদিন বলতেন তৃণমূলের মতো দল হয় না। সবাই সৎ। সবাই মানে তো ১০০ শতাংশ। কিন্তু এখন উলটো কথা বললে কী করে হবে? না দিদি, এ প্রশ্ন আমার নয়। গোটা রাজ্যের মানুষ এই প্রশ্ন করছেন। আমার মতো আপনার একান্ত ভক্তদের মনেও একই প্রশ্ন। তবে আপনাকে অস্বস্তিতে ফেলতে চাই না বলে করছি না।

তবে একটা কথা আপনি ঠিক বলেছেন বলে সবাই মনে করছে। আপনি সে দিন বলেছেন, 'কাঁঠাল গাছে আমের জন্ম হয় না। কখনও কখনও ভালো মানুষও বিপথে পরিচালিত হয়। অনেক ভালো মানুষও সঙ্গদোষে খারাপ হয়ে যায়। অবসাদে ভুগলে সেটা হতে পারে। তাঁদের জন্য সকলকে কুৎসা করা ঠিক নয়। তাঁদের আমাদের সঠিক পথে আনতে হবে। একজন শিক্ষক সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খাটছেন। অথচ কী একটা খারাপ করলেন, সেই নিয়ে হইহই হয়। তিনি যে বাড়িতে গিয়েও খাতা দেখছেন, তা তো বলি না!' আহা। কী সুন্দর বলেছেন। কিন্তু দিদি, আপনার অভিযুক্ত ভাইরা কোন্ সঙ্গদোষে পচে গেল সেটা কিন্তু জানা হলো না। কৌতূহল রয়েই গেল তা নিয়ে। এখন তো লোকে বলছে তৃণমূল গাছে আম, কাঁঠাল কিছুই হয় না। শুধু টাকা ফলে।

পড়ুয়াদের নৈতিক চরিত্র গঠনে শিক্ষকদের এগিয়ে আসা উচিত। ওই বিষয়ে অন্তত একটি করে ক্লাস নেওয়া উচিত। এটাও আপনি শিক্ষকদিবসে বলেছেন। আপনার কথায়, 'একটা করে ক্লাস রাখুন। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী (ব্রাত্য বসু)-কেও বলব একই কথা। এখনই তা হবে না। কারণ, পাঠক্রম তৈরি করতে হবে। পাঠক্রম সংবেদনশীল বিষয়। যাঁরা এটা নিয়ে কাজ করেছেন, গবেষণা করেছেন, তাঁদের দিয়ে করানো উচিত। যাঁরা জীবনটাকে উৎসর্গ করেছেন এই নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য, সেই শিক্ষকদের শামিল করা উচিত। পাঠক্রমে একটা বিষয় এই নিয়ে থাকা উচিত।'

কিন্তু কারা নেবেন সেই ক্লাস দিদি? যাঁরা অনৈতিক ভাবে শিক্ষক হয়েছেন তাঁরাই নৈতিকতার ক্লাস নেবেন? সেটা কী করে হবে বুঝতে পারছি না। বরং আপনি সেই ক্লাসটা নিতে পারেন। কী ভাবে বিরোধীদের প্রার্থী না দিতে দিয়ে ভোটে নৈতিক জয় পাওয়া যায়, কীভাবে সবাইকে মেরে ধরে বদলার বদলে বদল আনা যায়। কীভাবে, এক প্রকল্পের টাকা অন্য প্রকল্পে নৈতিকতা বজায় রেখে খরচ করা যায়, কীভাবে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম বদলে নিজের বলে চালিয়ে দেওয়া যায়; সেই নৈতিকতার ক্লাস আপনার চেয়ে ভালো আর কে নিতে পারেন! □

অতিথি কলম

সৌম্যকান্তি ঘোষ

করোনার আগের অর্থনীতির অগ্রগতি আবার ফিরে এসেছে

করোনা মহামারী বিশ্বের উৎপাদন ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও স্থান নির্বাচনের এজেন্ডায় নতুনভাবে ভাবার পরিস্থিতি তৈরি করেছে। এই পরিবর্তনে সর্বাপেক্ষা লাভবান ভারত।

কয়েকমাস ধরে জিডিপি করোনার আগের সময়ের হারকে টপকে যাওয়ার ফলে এটা বলাই যেতে পারে যে অর্থনীতি মধ্যম মেয়াদে (Medium term) উন্নয়নের পথ ধরে নিয়েছে। ২০২৩ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হার সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের প্রতিশ্রুতি ছিল ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি। বাস্তবে ১৩.৫ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ কিছুটা ঘাটতি নিশ্চয়। মনে রাখা দরকার ভারতের সাম্প্রতিক জিডিপি বৃদ্ধি বিশ্বের ২০টি বৃহৎ অর্থনীতির জিডিপি'র গড় বৃদ্ধির নিরিখে ২.৮ গুণ বেশি। উল্লেখিত দেশগুলির গড় ৪.৯ শতাংশ। নিশ্চিত সারা বিশ্বের ঝিমিয়ে পড়া অর্থনীতির পাশে ভারত এক ইতিবাচক ও উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। আমরা যদি বিভিন্ন সেশন অনুযায়ী জিডিপি বৃদ্ধির হারকে বিশ্লেষণ করি তাহলে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির একটি সুনিশ্চিত গতি দেখা যাবে। ত্রৈমাসিকের সঙ্গে ত্রৈমাসিকের বিভিন্ন সময়ের তুলনামূলক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২৩ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধির হার ৫.৬ (এখানে ১৩.৫ নয়) শতাংশ ২০১২-১৩ সালের পর সর্বাধিক।

ভালো দিকগুলি পরপর আলাদা করে বলা হচ্ছে।

(১) চীনে বাড়ি (ফ্ল্যাট) বিক্রির পরিমাণ ও অর্থাগম গত ১১ মাস ধরে নিম্নগামী। ১৯৯০ সালে চীনের প্রথম ব্যক্তিগত সম্পত্তি কেনার জন্য যে বাজার তৈরি হয়েছিল তারপর অতীতে এমন পতন কখনো হয়নি। এর বিপরীতে ২২-২৩-এর প্রথম ত্রৈমাসিকে ভারতে বিগত বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকের থেকে ৬০ শতাংশ বেশি বাড়ি বিক্রি হয়েছে। তার অর্থ অর্থনীতি বেগবান হওয়ায় লোকের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে।

(২) সামগ্রিক ভোগ্যপণ্যের বাজার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শহর অঞ্চলে চাহিদা বৃদ্ধি ঘটেছে। চুক্তিভিত্তিক নানা চাকরি বৃদ্ধি হওয়ার ফলেই এটা ঘটেছে। গ্রামাঞ্চলে চাহিদা বাড়া শুরু হয়েছে।

(৩) ব্যক্তিগত স্তরে ভোগ্যবস্তু-সহ অন্যান্য এমন অনেক জিনিস যেগুলির চাহিদা করোনার কারণে ৪.৭৭ ট্রিলিয়ন ২০২০-২১-এর প্রথম তিনমাসে কমে গিয়েছিল ১১০ শতাংশ বেড়েছে।

(৪) অর্থনৈতিক সেবাক্ষেত্র— ব্যাংক বা নন ব্যাংকিং লগ্নীকারী সংস্থা (NBFC) গুলিতে ঋণদান ৯.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩-এর তিন মাসে দেয় ঋণের পরিমাণ ৬ ট্রিলিয়ন (সব ডলারে)। এর মধ্যে চাকরি তৈরি হয় এমন MSME এবং খুচরো ক্ষেত্রে দেওয়া ঋণের পরিমাণই বেশি।

(৫) সমস্ত ধরনের সেবা ক্ষেত্রগুলিতেই মজবুত বৃদ্ধি ঘটেছে। যেমন হোটেল বা ভ্রমণ ক্ষেত্রের অর্থনীতিতে ২৫.৭ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। স্বাস্থ্য ও বিনোদন ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছে। স্বাস্থ্য ও বিনোদন ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হচ্ছে।

(৬) পরিসংখ্যানগুলি একটু বোঝার চেষ্টা করলে দেখা যাবে দেশে বিনিয়োগে বৃদ্ধি ঘটেছে। মোট পুঁজি তৈরি ও নিয়োজিতের (capital formation & employment) পরিমাণ ২০.১ শতাংশ বেড়েছে। CMIE নামে এই ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যান অনুযায়ী নতুন প্রোজেক্ট ঘোষণা করার ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগে জুন ত্রৈমাসিকে ১১৭ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটেছে। এই পরিসংখ্যানটি করোনার আগের সম সময়ের তুলনায় (করোনার সময়ের নয়)। একই সঙ্গে কৃষি ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটেছে যার অংশ জিডিপিতে বড়ো ভাগ তা ৪.৫ শতাংশ বেড়েছে। সবটাই ভালো নয় অর্থনীতির কিছু অপ্রিয় সংবাদ ও রয়েছে। তবে সেগুলি সবই ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি নির্ভর।

উৎপাদন ক্ষেত্রে যাকে ম্যানুফাচারিং সেক্টর বলা হয় সেখানে প্রথম তিনমাস বিশেষজ্ঞদের কিছুটা হতমান করে বৃদ্ধি ৪.৮ শতাংশে নেমেছে। এই ধরনের কমে যাওয়ার কারণ চটজলদি কিছুতেই নির্ধারণ করা যাচ্ছে

With Best Compliments from :-

A

Well Wisher

না কারণ এই ক্ষেত্রের আওতায় পড়া অন্য কোনো কিছুতেই নিম্নগতি দেখা যায়নি। আইআইপি (ইনডেক্স অব ইনডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশান) যা নির্দিষ্ট ভাবে উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত সেখানে ১২.৭ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটেছে। পাইকারী মূল্যসূচকও ১০.৩ শতাংশে অনেকদিন স্থিতু আছে। সে কারণে এই ধাঁধাটা সমাধান করতে গেলে এগুলো দেখা যাক।

(১) ৪০০০ কোম্পানির সরকারকে কর দেওয়ার পর হাতে থাকা লাভ ১৩০৬৩ শতাংশ বেড়েছে কখন ২০২২ সালের প্রথম তিন মাসে মানে ১ বছর আগে। তার কারণ ২০২২-এ প্রবল করোনা ছিল কাজকর্ম হয়নি। লক ডাউন চলেছিল। সেই ভিত্তিভূমি থেকে অবিশ্বাস্য লাফ।

(২) সেই তেরো হাজার থেকে ২০২৩-এর প্রথম তিন মাসে ওই লাভ ১১ শতাংশ বৃদ্ধিতে নেমে এসেছে, যেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। উৎপাদন ক্ষেত্রে বৃদ্ধির এতটা কম পরিসংখ্যানের কারণ ২০২১ আর ২২-এর মধ্যে এই আকাশ-পাতাল তফাতের কারণেও হতে পারে।

(৩) আরও একটি বাস্তব সত্য হচ্ছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। উৎপাদন ক্ষেত্রের মূল উৎপাদনগুলির বিভিন্ন যান্ত্রিক উপকরণ ছাড়াও জ্বালানী তেলের দামের ব্যাপক টালমাটাল বড়ো ভূমিকা নিয়েছে।

এখন সামগ্রিক পরিস্থিতি দেখে কেন আমাদের সাবধান হওয়ার দরকার আছে তা দেখা জরুরি। জিডিপির পরিসংখ্যানগুলি নিরীক্ষণ করলে দেখা যাচ্ছে বৈদেশিক ক্ষেত্রের পটভূমি কিছুটা অনিশ্চিত। ২০২২-এর প্রথম তিনমাসের রপ্তানি বৃদ্ধি ঘটেছে ১৪.৭ শতাংশ কিন্তু আমদানী সবকিছু ছাপিয়ে ৩৭.২ শতাংশ বেড়েছে। আমদানী ক্ষেত্রে এই ব্যাপক বৃদ্ধির সঙ্গে টাকার অবমূল্যায়ন মিলে সামগ্রিক রপ্তানির ভূমিকাকে জিডিপি ক্ষেত্রে ভীষণ নামিয়ে দিয়েছে।

রপ্তানি ক্ষেত্রে এই পিছিয়ে পড়া অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের ওপর চাপ বাড়াবার লক্ষণ। বিশেষ করে আমরা যে জিনিসগুলি বেশি রপ্তানি করি সেখানে চাহিদায় ঘাটতি নজরে পড়ছে। এগুলি মাথায় নিয়েও মিডিয়াম টার্ম অর্থাৎ খুব দীর্ঘকালীন না হলেও মধ্যবর্তী বছরগুলিতে উন্নয়ন উচ্চমুখী থাকবে!

কয়েকটি উদাহরণ : (১) Iphone উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশ্বখ্যাত foxconn চেন্নাই-এ ১৪টি উৎপাদন হাব তৈরি করেছে। এ পর্যন্ত যে বিপুল বরাত কোম্পানিগুলি পেয়েছে তা কেবল একটা জিনিসই পরিষ্কার করে যে বিদেশি প্রযুক্তিধারী উৎপাদন সংস্থাগুলি এখন আর কেবলমাত্র চীন কেন্দ্রিক নয়। তারা এখন চীন ও আরও একটি দেশ (china plus one) যেখানে উৎপাদন প্রক্রিয়া চালানোর মতো সুব্যবস্থা আছে তাকে চিহ্নিত করেছে। দেশটির নাম ভারত। বিদেশি উৎপাদকদের উৎপাদন কেন্দ্রগুলির নতুন করে স্থান নির্বাচিত হচ্ছে। আর বিদেশি উৎপাদকদের ভারতকে পছন্দের গন্তব্য হিসেবে বেছে নেওয়া খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যাকে বলে এই ধরনের আভিজাত্য অর্জন শুধু ফোন নয় এক ব্যাপক উৎপাদন উপযুক্ত বস্তু শৃঙ্খলের সম্ভাবনা তৈরি করতে সক্ষম। এর মধ্যে থাকবে চিপ থেকে কয়লা। করোনা মহামারী বিশ্বের উৎপাদন ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও স্থান নির্বাচনের এজেন্ডায় নতুনভাবে ভাবার পরিস্থিতি তৈরি করেছে। এই পরিবর্তনে সর্বাপেক্ষা লাভবান ভারত।

টাকা কিছুকাল ধরে কেমন আচার আচরণ করছে সেটাও পর্যালোচনার অন্তর্ভুক্ত। আমি ইতিপূর্বে এই কলমে জোরের সঙ্গে বলেছিলাম টাকায় বিরাট ডামাডোল হবে না। আজকের তারিখে দেশের উন্নত ইউরোপীয় দেশগুলির ও জাপানের মুদ্রার ডলারের সঙ্গে বিনিময় হারে যে অবমূল্যায়ন হয়েছে যেমন ইউরো বা ইয়েন তার তুলনায় আমাদের টাকার দাম শতাংশের হিসেবে অনেক কম পড়েছে। এই মূল্যায়ন সব সময়ই ইউএস ডলারকে মানদণ্ড ধরেই নির্ণয় করা হয়। এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার ভারতের অর্থনীতি অনেক বেশি মজবুত। আরও একটি দিক একটু সহজবোধ্য না হলেও বলতে হয় যে সরকারকে ঋণ দিলে যে সুদ পাওয়া যায় (বিদেশি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ইত্যাদি) সেটিও পোক্ত ভিতের ওপর ছিল। বিশ্বে বহু অর্থনীতিতে তখন টালমাটাল চলেছে (volatality) দেশে বাইরে থেকে আসা টাকা নিয়োজিত হতে কোনো ঘাটতি পড়েনি যতই না যুদ্ধের আশঙ্কা থাক। সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য অর্থনীতিতে চাপ পড়লেও ভবিষ্যতের জন্য অর্থনীতি ক্রমিক ও ছেদহীন বৃদ্ধির পথেই এগোবে। বিশ্বের অন্য কোনো দেশ সম্পর্কে এমন আগাম বলা নিশ্চিত নয়।

(লেখক স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার মুখ্য অর্থনৈতিক (গ্রুপ) উপদেষ্টা)

শোকসংবাদ

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সহ সংগঠন সম্পাদক কিমাংশু মণ্ডল গত ২ সেপ্টেম্বর বহরমপুর নিবেদিতা নার্সিং হোমে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। দীর্ঘ ৩৫ বছর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পূর্ণকালীন কার্যকর্তা থাকার পর ২০১৮ সালে প্রচারক জীবনের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনার বকখালির হরিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ণকালীন জীবনে তিনি মালদা জেলা সংগঠন সম্পাদক, গোপালী আশ্রমের ব্যবস্থাপক, পরিষদের প্রদেশ কার্যালয় প্রমুখ ইত্যাদি দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন। মৃদুভাষী ও অনাড়ম্বর জীবনে যখন যে দায়িত্ব এসেছে তা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন।

পাত্র চাই

পাত্রী সাধুখাঁ পঃ বঃ শান্তিপুর 51 বঃ+ 5' 2" মধ্যমবর্ণা, সুশ্রী, সঙ্গীতজ্ঞা, জমি-সহ নিজ বাড়ি, সঃ / অসঃ, সঙ্ঘ অনুগামী উপযুক্ত পাত্র অগ্রগণ্য।

যোগাযোগ — গৌর চন্দ্র গড়াই, চুঁচুড়া
ফোন - 9836304624

হাসিনার সফরের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত-বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্ক কোন পথে ?

এই প্রতিবেদন যখন লেখা হচ্ছে তখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তিনদিনের ভারত সফর শুরু হয়েছে। শেখ হাসিনার সফরের পরিপ্রেক্ষিতে দু'দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক কোন দিকে মোড় নেয় বা পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ কোন দিকে যায় তার দিকে আমাদের নিশ্চয়ই নজর থাকবে। তবে শেখ হাসিনা তাঁর ভারত সফরের শুরুতে খুব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কথা বলেছেন। তার নির্যাস নীচে সাজিয়ে দেওয়া হলো :

(১) বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সে দেশের সংখ্যালঘুদের ওপর যে অত্যাচার হয়েছে তা অনাকঙ্ক্ষিত। সব দেশেই বিশেষ করে ভারতেও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হয়েছে।

(২) গোরুপাচারের পরিপ্রেক্ষিতে শেখ হাসিনার মন্তব্য, ভারতের গোরুর ওপর নির্ভরশীল নয় বাংলাদেশ। সীমান্তে গোরুপাচার নিয়ে পরিস্থিতি উদ্বেগজনক স্বীকার করে নিয়েও তাঁর মন্তব্য, এ ব্যাপারে দু'দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আলোচনা চলছে, কিন্তু ভারতকে আরও ধৈর্য ধরতে হবে।

(৩) এরই পাশাপাশি ভারতকে মূলত তিনটি বিষয়ে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। প্রথমত, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশি ছাত্রদের ফিরিয়ে আনতে ভারতের ভূমিকা। দ্বিতীয়ত, করোনাকালে টিকা সরবরাহের জন্য ভারতের প্রশংসা এবং তৃতীয়ত, গঙ্গা, তিস্তা-সহ বিভিন্ন নদীগুলির জলবণ্টনের সমস্যার বিষয়ে ভারত আন্তরিক বলে হাসিনার অভিমত। প্রসঙ্গত, হাসিনা তাঁর ভারত সফরের প্রাক্কালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। এবং তাঁকে সেই দুর্দিনে আশ্রয় দিয়েছিল বলে কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছেন।

পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ঘটনার দিকে চোখ রাখলে দেখা যাবে চীনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে শ্রীলঙ্কার অর্থনীতিতে ধস নামার পর বাংলাদেশ সরকার সতর্কতা অবলম্বন করেছে। চীনের পাতা ফাঁদে আর পা দিচ্ছে না তারা। তাই ঢাকা-চট্টগ্রাম উচ্চ গতির রেল সংযোগ প্রকল্পটি বাতিল করে দিয়েছিল তারা। প্রায় হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের এই প্রকল্পটি রূপায়িত করতে চীনের বারংবার অনুরোধেও বরফ গলেনি বলে সূত্রের খবর। বরং কিছুদিন আগে পদ্মাসেতুর উদ্বোধনে চীনা নির্মাণ সংস্থা এই সেতু তৈরি করলেও এ ব্যাপারে চীনের থেকে কোনো অর্থসাহায্য নিতে হয়নি বলে বাংলাদেশ সরকার জোরদার প্রচার চালিয়েছে। চীনের সেদেশে পরিকাঠামো খাতে বিনিয়োগে ভারতের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই বলে বাংলাদেশের তরফে আশ্বস্তও করা হয়েছে।

কূটনীতিকরা মনে করছেন, বাংলাদেশ জাপান বা এডিবির থেকে মোট অঙ্কের ঋণ নেয় বলে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক স্বার্থেই চীনের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখবে। তাছাড়া চোখের সামনে শ্রীলঙ্কার অবস্থা খারাপ হতে দেখেছে। এই পরিস্থিতিতে চীনের সঙ্গে দূরত্ব বাড়লে কূটনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশকে ভারতের কাছে আসতেই হবে। কিন্তু দু'দেশের তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেক ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাংলাদেশ মুখে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বললেও সেদেশে সংখ্যালঘুরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের চেয়ে বেশি কিছু গণ্য হন না। এক্ষেত্রে তারা কূটনৈতিকভাবে ভারতের দিকে আঙুল তুললেও বিশেষজ্ঞরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, এদেশে সংখ্যালঘুরা সমান অধিকার পান এবং দীর্ঘদিন ধরে এদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগে তোষিত সম্প্রদায় হিসেবে গণ্য। তাই অন্যদেশে সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতি দিয়ে এদেশের সংখ্যালঘুদের বিচার চলে না।

সীমান্তে গোরুপাচার নিয়ে ভারতকে ধৈর্যশীল হওয়ার পরামর্শ দিলেও সীমান্ত বন্ধে বাংলাদেশ কতটা আন্তরিক তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। কারণ সেদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি আজও মোল্লাবাদীদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। এবং সে কারণেই ভারতের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। অতি সম্প্রতি, মালদহে এক বাংলাদেশিকে পাকড়াও করেছে পুলিশ, যে জাল পাসপোর্টের নথিতে পিসেমশাইকে বাবা সাজিয়ে ভারতে জন্মকর্মের যাবতীয় প্রমাণ জোগাড় করে ফেলেছিল এবং বাংলাদেশের সঙ্গেও যোগসাজশে অনুপ্রবেশের পুরো ব্যাপারটাই আইনসিদ্ধ করার তালে ছিল। এটা একটা উদাহরণ মাত্র। ভারতীয় গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়ে এরকম কত ফন্দিফিকিরের ঘটনা ঘটছে তা রীতিমতো চিন্তায় রাখছে তথ্যাভিজ্ঞ মহলকে। এদের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ শেখ হাসিনার নেই।

তবে ভারত হাসিনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, ভারত প্রতিবেশী দেশগুলির উন্নয়ন খাতে যত খরচ করে তার একচতুর্থাংশই খরচ হয় বাংলাদেশের পেছনে। সুতরাং ঘনিষ্ঠ সহযোগীর থেকে ভারতের প্রত্যাশা অনেক বেশি। এই সুযোগে হাসিনাও জলবণ্টন-চুক্তি ও রোহিঙ্গাদের যাতে মায়ানমার ফেরত নেয়, সে ব্যাপারে দিল্লিকে তৎপর করতে চাপ বাড়াবেন। যদিও কূটনীতিজ্ঞদের মতে, ভারতের বিদেশনীতি এখন অনেক পরিণত। সুতরাং ভারতকে চাপ দিয়ে কার্যসিদ্ধি করা মুশকিল। বরং ভারতেরই উচিত, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের অধিকার নিশ্চিত করা। বাংলাদেশকে মোল্লাবাদমুক্ত করার এটাই উপযুক্ত সময় বলে তাঁরা মনে করেন। কতটা কী হবে, তার দিকে আমাদের নজর থাকবে।

সাবেক বাঙ্গালিয়ানা থেকে দূরে সরে গেছে কলকাতা

অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায়

গড়িয়াহাট মার্কেট থেকে যারা পুজো শপিং করেন তাদের কাছে দুর্গাপুজো ঠিক কোন চেহারায় আসে— পুজো না উৎসব? প্রশ্নটি জরুরি, কারণ মোটমুটি আশির দশক থেকেই পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে কলকাতায় দুর্গাপুজোকে উৎসবে রূপান্তরিত করার সর্বাঙ্গীণ চেষ্টা শুরু হয়ে গেছে। এবং এই চেষ্টা যে অনেক দূর পর্যন্ত সফলও হয়েছে, তাও স্বীকার করতে হবে। নিজেদের কলোনিয়াল বেঙ্গলি ভাবতে এখনও যারা শ্লাঘাবোধ করেন তাদের কাছে সেই সময়ে ইংরেজি স্টেটসম্যান পত্রিকা ছিল এলিটিজমের আয়না। আজকাল অবশ্য স্টেটসম্যান নামেই তালপুকুর, ঘটি ডোবে না। কিন্তু তখন তা ছিল না। এই পত্রিকাই দুর্গাপুজোকে উৎসব বানানোর পরিকল্পনা করেছিল। ধীরে ধীরে স্টেটসম্যানের পরিকল্পনা বামপন্থী রাজনীতির পরিসরে ডালপালা ছড়াতে শুরু করে। নব্বইয়ের দশক থেকে দেখা গেল শুধু দুর্গাপুজো নয়, হিন্দুদের সব বড়ো পুজোই উৎসবে পরিণত হয়েছে। বামপন্থীরা চতুর শ্রেণীভুক্ত জীব। তারা জানেন পুজো-আর্চা থেকে ধর্মের নির্যাস বের করে দিয়ে সেকুলার হোয়াইটওয়াশ দিয়ে উৎসব বানালে সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক আরও পুষ্ট হয়। এবং হিন্দু বাঙ্গালি তার অপৌরুষেয় সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শেষমেশ প্যান-ইন্ডিয়ান আত্মবোধ থেকে ছিটকে পড়ে। অর্থাৎ যে বাঙ্গালি একদিন এক হাতে গীতা আর অন্য হাতে রিভলবার নিয়ে ভারতকে ব্রিটিশের কবল থেকে মুক্ত করার যুদ্ধে নেমেছিল তারা সেই ভারতবোধ থেকেই দূরে সরে যায়। সুতরাং যে প্রশ্নটা দিয়ে এই নিবন্ধ শুরু করেছিলাম, তার উত্তর না খুঁজলেই নয়। কারণ কলকাতাকে আর সাবেক বাঙ্গালিয়ানার ভরকেন্দ্র বলা যাবে না। অর্থাৎ অনেক কিছুর সঙ্গে কলকাতার বাঙ্গালি তার বড়ো সাধের বাঙ্গালিয়ানাও হারিয়েছে।

একবার এক প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ এই নিবন্ধ লেখককে বলেছিলেন, কলকাতা থেকে ব্রিটিশ চলে যাওয়ার অর্থ কলকাতা শেষ। ব্রিটিশ আমলে কলকাতার যে ভায়াব্রানসি ছিল তা কি আর দেখতে পান? কেন পান না জানেন? রেনেসাঁ কলকাতাকে যে শেকড়ের সন্ধান দিয়েছিল সেটাকেই সযত্নে ছেঁটে ফেলা হয়েছে স্বাধীনতার পরের সাত দশকে। অর্থনীতিবিদের এই মন্তব্যকে

> “বাঙ্গালির সঙ্গে বাংলাদেশের হিন্দুদের কি কোনও তফাত আছে? নাকি, নব্বইয়ের দশকের কাশ্মীরি পণ্ডিতদের তফাত আছে? এসব প্রশ্ন বাঙ্গালিকে ভাবতে হবে।”

অনায়াসে ফ্রাসট্রেশন বলে চালিয়ে দেওয়া যেত কিন্তু আজকের কলকাতাকে দেখে মনে হয় তিনি ভুল কিছু বলেননি। যখন দেখা যায় কলকাতার বাঙ্গালি বসন্তের নির্ঘোষ জলাঞ্জলি দিয়ে ও সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের কাছে বন্দুক-পিস্তল জমা দিয়ে জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে ম্যানিপুলেটিভ বামপন্থী হয়ে উঠল এবং ২০১১-র পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা-মাটি-মানুষ কর্মকাণ্ডের পতাকাবাহক হয়ে উঠল তখন সত্যিই কলকাতার জন্য করুণা হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এমন অনাসৃষ্টি ভোল বদল কীভাবে সম্ভব? বিশেষ করে যেখানে বাম ও তৃণমূলের নিউক্লিয়াস আলাদা। এই তর্কের মীমাংসা খুব কঠিন নয়। নিউক্লিয়াস আলাদা হলেও অ্যাজেন্ডা এক। প্যান-ইন্ডিয়ান মাইন্ড সেট ভেঙে দেওয়া। বাঙ্গালির মন থেকে জাতীয়তাবোধ মুছে দেওয়া। ঠিক যেমনটি মেকলে সাহেব চেয়েছিলেন। মেকলের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের মানুষকে একটি ছিন্নমূল প্রজাতিতে পরিণত করা। তাদের স্বদেশের ধারণা থাকবে না, ধর্ম থাকবে না, সংস্কৃতি থাকবে না— থাকার মধ্যে থাকবে শুধু প্রো-খ্রিস্টান ইংরেজিয়ানার বড়াই। যাতে তারা প্রথম স্বাধীনতা মহাসংগ্রামের (১৮৫৭) মতো প্যান-ইন্ডিয়ান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ না হয়। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন গান্ধীজীও তাঁর অহিংসানীতির প্রবর্তন করেছিলেন ব্রিটিশদের মনস্তাত্ত্বিক সুবিধা দেবার জন্য। কারণ ১৮৫৭-র পর কয়েক দশক কেটে গেলেও ইংরেজরা সেই সময়ের বীভৎস অভিজ্ঞতার কথা ভুলতে পারেনি। ১৯৪৬-৪৭ সালের নৌসেনাদের বিদ্রোহ তাদের নতুন করে ১৮৫৭-র কথা মনে

ফঃ ২

করিয়ে দিয়েছিল এবং তারা তড়িঘড়ি ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নিয়েছিল।

বস্তুত, বিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁ বাঙ্গালিকে যে জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল চরিত্রে তা কোনোভাবেই সেকুলার ছিল না। তার প্রমাণ পাওয়া যাবে বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ স্তোত্রে, অবনীন্দ্রনাথের ভারতমাতার আইডিয়ায়। স্বামীজী বললেন, আগামী পঞ্চাশ বছর ভারতবাসী শুধু দেশজননীর সাধনা করুক। রবীন্দ্রনাথ তার অসংখ্য গানে-কবিতায় ভারতের আধ্যাত্মিক রূপটি স্পষ্ট করে দিলেন। তাঁর কাছে ভারত মানে আধ্যাত্মিক ভারত, বেদ-উপনিষদের আলোয় আলোকিত ভারত। শ্রীঅরবিন্দ সশস্ত্র সংগ্রামের পথে যেতে যেতে আধ্যাত্মিক জন্মান্তরের সন্ধান পেলেন। স্বামীজীর ভাবশিষ্য সুভাষ সন্ন্যাসী হবার সংকল্প ত্যাগ করে স্বদেশের মুক্তির সংগ্রামে নেতৃত্ব দিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল রক্ষাকালী পুজোয় সাদা ছাগল বলি দেওয়ার কথা বললেন। কারণ সাদা ছাগল শ্বেতাঙ্গ ইংরেজের প্রতীক। গীতা হয়ে উঠল মাস্টারদা-ক্ষুদিরামের জীবনবেদ। অর্থাৎ এদের কাছে রাজনৈতিক ভারতের শক্তিকেন্দ্র ছিল আধ্যাত্মিক ভারত। এরা সকলেই স্বভাবে ও স্বধর্মে ছিলেন প্যান-ইন্ডিয়ান। এরা আগে ভারতীয়, পরে বাঙ্গালি। এরা জানতেন বাঙ্গালির বাঙ্গালিয়ানার আইডিয়া একেবারেই রাজনৈতিক নয়, বরং সাংস্কৃতিক। এই বাঙ্গালিয়ানা মুখের ভাষা আর আধ্যাত্মিক ভারত ও হিন্দুয়ানির ওপর নির্ভরশীল। একটা না থাকলে অন্যটাও থাকবে না। বাঙ্গালির প্যান-ইন্ডিয়ান আইডেন্টিটি কিংবা বাঙ্গালিয়ানা, যাই বলা হোক না কেন, তাতে প্রথম আঘাত হানা হয়েছিল বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে। দেশজুড়ে প্রবল গণ-আন্দোলন এবং বিরোধিতার ফলে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। তারপর এল দ্বিতীয় আঘাত— দেশভাগ। কংগ্রেস ও বামেরা পাকিস্তান প্রস্তাব সমর্থন করে দেশভাগে ইন্ধন জোগাল। এই মর্মান্তিক আঘাত বাঙ্গালি সামলাতে পারল না। তারপর সত্তরের দশকে নিজের মাটি ছেড়ে ছিন্নমূল হয়ে ওঠার বেদনায় দীর্ণ বাঙ্গালির ওপর নেমে এল শেষ ও সব থেকে মোক্ষম আঘাত--- নকশাল আন্দোলন। একটি আপাদমস্তক নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের ঠেলায় পড়ে সর্বভারতীয় স্তরে বাঙ্গালি তার আইডেন্টিটি হারিয়ে হয়ে গেল জঙ্গি বাঙ্গালি। ধীরে ধীরে একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো বাঙ্গালিকে।

তখন বাম আমল। বামেদের জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ফলে সেইসময় পশ্চিমবঙ্গে একটার পর একটা কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে। বাম আমলে ৩৪ বছরে ৫৬ হাজার কলকারখানা বন্ধ হয়েছে। বাঙ্গালি তার সাহিত্য, শিল্পকলা, সংগীত— সব হারিয়েছে। বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে অর্থনীতি। বাঙ্গালির চাকরি নেই, ব্যবসা নেই। শুধু লোকাল কমিটি আর সিন্ডিকেট আছে। সত্তরের দশকের গোড়ায় দেশের মোট জিডিপি-তে পশ্চিমবঙ্গের অবদান ছিল ৩০ শতাংশ। ২০১১ সালে রাজ্যের ডিজিপি নেমে গিয়েছিল ৩ শতাংশে। এখন বোধহয় আরও কম। ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের কোনও ঋণ ছিল না। কিন্তু ৩৪ বছরে জ্যোতিবাবু-বুদ্ধদেববাবুরা যে ঋণের পাহাড়ে পশ্চিমবঙ্গকে বসিয়ে গেছেন তার পরিমাণ ১ লক্ষ ৮৬ হাজার কোটি টাকা। এই ঋণের পরিমাণ তৃণমূল আমলে বেড়ে হয়েছে প্রায় ৬ লক্ষ কোটি টাকা। কিন্তু শুধুই কি অর্থনৈতিক বিপর্যয়? একেবারেই নয়। গত চুয়াল্লিশ বছরে বাঙ্গালি সব থেকে দামি যে জিনিস হারিয়েছে তা হলো তার বাঙ্গালিয়ানা। তার দুর্গাপুজো হয়ে গেছে উৎসব। বছর শেষে করে খাওয়ার ইন্ডাস্ট্রি। অতিবাম হবার নেশায় বাঙ্গালি যতই তার হিন্দুয়ানির শেকড় ছেঁটে এক নাম-না-জানা তেপান্তরের মাঠের দিকে এগোতে চেয়েছে ততই তার প্যান-ইন্ডিয়ান আইডেন্টিটি ভেঙে পড়েছে। বাঙ্গালি হয়ে গেছে হয় ক্রীতদাস নয়তো দলদাস। এখন পশ্চিমবঙ্গের ডেমোগ্রাফিতে বাঙ্গালি হিন্দু অবান্তর। তার ভোটাধিকার থাকলেও বুথে গিয়ে ভোট দেবার ক্ষমতা নেই। একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ব্লক ভোটিং ও পেশিশক্তির কাছে সে অসহায়। তার রাজনৈতিক ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করে ক্ষমতাসীন দল। অর্থনৈতিক ভারসাম্য হারানোর ফলে বাঙ্গালিকে এখন নির্ভর করতে হয় লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো ভিক্ষাপ্রকল্পের ওপর। এই বাঙ্গালির সঙ্গে বাংলাদেশের হিন্দুদের কি কোনও তফাত আছে? নাকি, নব্বইয়ের দশকের কাশ্মীরি পণ্ডিতদের তফাত আছে? এসব প্রশ্ন বাঙ্গালিকে ভাবতে হবে। এখনই না ভাবলে হয়তো অনেক দেরি হয়ে যাবে।

বাঙ্গালির এমনতর তীব্র আত্মসঙ্কটের মধ্যে আরও একবার দুর্গাপুজো আসছে। মহালয়ারও আজ বিশেষ দেরি নেই। কিন্তু এই দুর্গাপুজো কি পুজো নাকি উৎসব? আর কিছুদিন পরেই রাস্তার মোড়ে মোড়ে বড়ো বড়ো বিলবোর্ডে লেখা থাকবে— ধর্ম যার যার উৎসব সবার। কলকাতার থিমের পুজোয় যান্ত্রিক পরিসরে পপ কর্নের প্যাকেট হাতে ঘুরতে ঘুরতে বাঙ্গালির কি মনে হবে না যে কথাটা ঠিক নয়? হিন্দুর যে কোনও পুজোই উৎসব কিন্তু সেটা ধর্ম বাদ দিয়ে নয়। ধর্ম তো পথ— সংস্কৃতি। সেই পথে যেতে যেতে কেউ দুর্গাপুজো করবে আবার কেউ হয়তো কৃষ্ণের ভজনা করবেন। দেখতে চাইলে গ্রামেগঞ্জে যান। দেখতে পাবেন কোথাকার এক অচেনা বাউল সাধক তাঁর সাধনসঙ্গিনীকে নিয়ে প্যান্ডেলে এসে বসবেন। ঢাক থামলে শুরু হবে তার গান— যেই কৃষ্ণ সেই তো উমা। তোমরা শুধু ফারাক করো, মিলন জানো না।

এরা কেউ ধর্মের শেকড় ছেঁটে ফেলেনি, তাই এদের উৎসব কোনওদিন শেষই হয় না।

With Best Compliments from :-

A

Well Wisher

মিসিং লিংক

পনেরো হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা

সন্দীপ চক্রবর্তী

সেলডম পোলকের নাম অনেকে শুনেছেন, আবার অনেকে হয়তো শোনেননি। পোলক আমেরিকার হার্ভার্ড ইউনিভর্সিটির পোস্ট মর্ডার্ন স্টাডিজে একজন দিকপাল হিসেবে গণ্য হন। তাঁর গবেষণার ক্ষেত্রটি হলো ইতিহাস, আরও বিশদে বললে, ভারততত্ত্ববিদ্যা। পপুলেশন জেনেটিক্স বা সহজ ভাষায় ডিএনএ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি ভারততত্ত্ববিদ্যায় নিত্যনতুন আলোকপাত করে চলেছেন। যদিও ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে যে বিপুল তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে সেই নিরিখে বিচার করলে পোলকের এই আলোকপাত অ্যাজেন্ডা বলে মনে হওয়াটা স্বাভাবিক। কারণ তিনি ডিএনএ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের ভক্ত ঐতিহাসিকদের বহু চর্চিত (এবং অধুনা পরিত্যক্ত) আর্য অভিবাসন তত্ত্বকে নতুন করে উসকে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। বলাবাহুল্য, সেলডম পোলকের নতুন তত্ত্বকে ভারতে প্রতিষ্ঠা করতে কোমর বেঁধে আসরে নেমে পড়েছেন কিছু বামপন্থী ঐতিহাসিক ও সাংবাদিক। এদের মধ্যে সাংবাদিক টনি জোসেফের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ তিনি 'আরলি ইন্ডিয়ান' নামে একটি বইও লিখে ফেলেছেন, যার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন রোমিলা থাপার প্রমুখ ঐতিহাসিক।

সেলডম পোলকের দাবি নিয়ে আলোচনা করার আগে পপুলেশন জেনেটিক্সের প্রাথমিক কিছু কথা জেনে নেওয়া দরকার। জিন মানুষের শরীরের এমন একটি একক যা বাবা-মা'র শরীর থেকে সন্তানের শরীরে যায়। কোনও জনগোষ্ঠীর জিনকে বলে জিন পুল। সেলডম পোলক ভারত থেকে স্যাম্পেল নিয়ে যে সমীক্ষা

মহেঞ্জোদরোর স্নানাগারের ৩-ডি চিত্র।

করেছিলেন তাতে দেখা গেছে ভারতের ৫০-৬০ শতাংশ মানুষ হ্যাপলো গ্রুপের (R1a 1a) অন্তর্গত। এই হ্যাপলো গ্রুপ বিশ্বের প্রাচীনতম জিন গ্রুপ। আফ্রিকা ছাড়া এই জিন গ্রুপের মানুষ দেখা যায় ভারত, মধ্য এশিয়া, সিরিয়া ও ইউরোপে। সেলডম পোলক দাবি করেছেন যে আর্যদের প্রকৃত হোমল্যান্ড ছিল মধ্য এশিয়ায় ও সিরিয়ার অ্যানাটোলিয়ায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অ্যানাটোলিয়ার কথা আমরা পাই বাইবেলে।

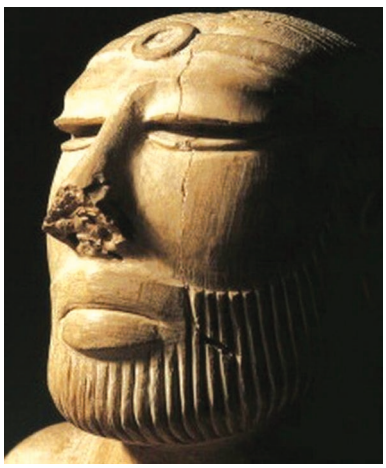

ধ্যানস্থ যোগী

আর্যরা তাদের হোমল্যান্ড থেকে ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ ভারতে এসেছিল এ দেশের গুহাবাসী (তখনও নাকি ভারতে প্রস্তরযুগ চলছে) মানুষকে চাষাবাদ শেখাতে। কারণ বিশ্বে প্রথম কৃষিকাজের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল মেসোপটামিয়ায়। সেই হিসেবে কৃষিবিদ্যা মেসোপটামিয়ানদের ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি। তারাই নাকি সারা বিশ্বে কৃষিবিদ্যা ছড়িয়ে দেয়। পোলকের দাবি, মেসোপটামিয়ার 'আর্যদের' এমনই একটা দল স্ত্রী ও সন্তানদের নিজের দেশে রেখে ১৫০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ নাগাদ ভারতে এসে উপস্থিত হয় কৃষিকাজ শেখানোর জন্য। এবং কৃষিকাজ শেখানোর পাশাপাশি তারা এখানকার মহিলাদের সঙ্গে যথেচ্ছ মেলামেশা শুরু করে, ফলে কোনওরকম যুদ্ধবিগ্রহ বা রক্তপাত ছাড়াই তাদের জিন ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। তবে এখানকার মহিলাদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশায় কেন পুরুষরা বাধা দেয়নি সে ব্যাপারে পোলক কিছু বলেননি।

সত্যি কথা বলতে, সেলডম পোলকের যুক্তি বেশ বৈষম্যমূলক এবং হাস্যকরও বটে। যারা ভালো কাজ করার জন্য অন্য কোনও ভূখণ্ডে যাচ্ছে অর্থাৎ যাদের মনে সশস্ত্র

যোগব্যানের টেরাকোটা মূর্তি (হরপ্পা)।

হামলা করে মানুষ মারার কোনও অভিপ্রায় নেই, তারা স্ত্রী-পুত্র-পরিবার কেন নিজের দেশে রেখে আসবে সেটা স্পষ্ট নয়। আবার এখানকার মহিলাদের সঙ্গে যথেচ্ছ সংসর্গ (যাকে পোলক গণধর্ষণ বলতে চান না) করার সময় স্থানীয় পুরুষেরা কেন বাধা দিলেন না, তাও স্পষ্ট নয়। ব্যাপারটা এরকম, মেসোপটামিয়ার কৃষিনিপুণ একদল লোক এসে ভারতের মহিলাদের সঙ্গে অবাধ শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করল কিন্তু তাদের পুরুষ সঙ্গীরা চুপচাপ এই অত্যাচার মেনে নিল। এই ধরনের আচরণ সাধারণভাবে যুদ্ধে কোনও বিজয়ী গোষ্ঠী পরাজিত গোষ্ঠীর সঙ্গে করে। কিন্তু পোলক প্রথমেই মেসোপটামিয়ার কৃষিজীবীদের ভারতে আসাকে অভিবাসন (Migration) বলেছেন, আগ্রাসন (Invasion) বলেননি। তাই যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের কোনও প্রশ্ন উঠছে না।

পোলকের যুক্তির ফাঁক বোঝার জন্য আগে বেদে বর্ণিত প্রাচীন ভূগোলটি বোঝা দরকার। ঋকবেদ স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছে বৈদিক সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ছিল সপ্তসিন্ধুর (সপ্ত সিন্ধবা) তীরবর্তী অঞ্চলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতার (হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো) মানচিত্রও হুবহু এর সঙ্গে মিলে যায়। সপ্ত সিন্ধু বলতে সরস্বতী ও সিন্ধু এবং সিন্ধুর পাঁচটি শাখানদী শতদ্রু, পারুসনী, অসিকানি, বিতস্তা ও বিপাশাকে বোঝানো হয়েছে। এইসব নদীর বর্তমান নাম যথাক্রমে সুটলেজ, রাভি, চেনাব, ঝিলম ও বিয়াস। ঋকবেদের নবম মণ্ডলের পুরোটাই সরস্বতীর স্তুতিতে উৎসর্গীকৃত। সরস্বতীকে বলা হয়েছে 'নদীতমে' অর্থাৎ নদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এছাড়াও বেদে সরস্বতীকে বলা হয়েছে, 'mother of the Sindhu', mother of flood', 'Stream of consciousness' ইত্যাদি। যোগ্য বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়া গেল না বলে ইংরেজিতে লিখতে হলো। প্রশ্ন হলো, এত স্তুতির কারণ কী? কারণ সরস্বতীর বিশাল আয়তন। বেদ বলছে সরস্বতীর জন্ম হিমালয়ে এবং সঙ্গম কচ্ছের রন পেরিয়ে সাগরে (অধুনা আরব সাগর)। ১৯৭২ সালে আমেরিকার উপগ্রহ ল্যান্ডস্যাট প্রথম হরিয়ানা- রাজস্থান অঞ্চলের শুকিয়ে যাওয়া নদীর প্যালিওচ্যানেলের (প্রাচীন নদীখাত) ছবি পাঠায়। পরে ইসরোর গবেষণায় আরও অনেক ছবি পাওয়া গেছে। ভূতাত্ত্বিক গবেষকেরা প্রমাণ করেছেন এই প্যালিও চ্যানেলটি সরস্বতীর নদীখাত। বর্তমানে এই খাত দিয়ে মূলত বৃষ্টির জলে পুষ্ট ঘগ্‌গর-হাকরা নদী বয়ে যায়। ভূতত্ত্ব, সিসমোলজি ও ওশিয়ানোগ্রাফির তথ্যপ্রমাণ অনুযায়ী সরস্বতীর দৈর্ঘ্য ছিল ৪,৬০০ কিলোমিটার। সুতরাং ঋকবেদের একটি মণ্ডল কেন সরস্বতীকে উৎসর্গ করা হয়েছিল, তা সহজেই অনুমেয়। আয়তনে সরস্বতী গঙ্গার দ্বিগুণ। ব্রহ্মপুত্র ছাড়া আর কারোর

পশুপতি শিব

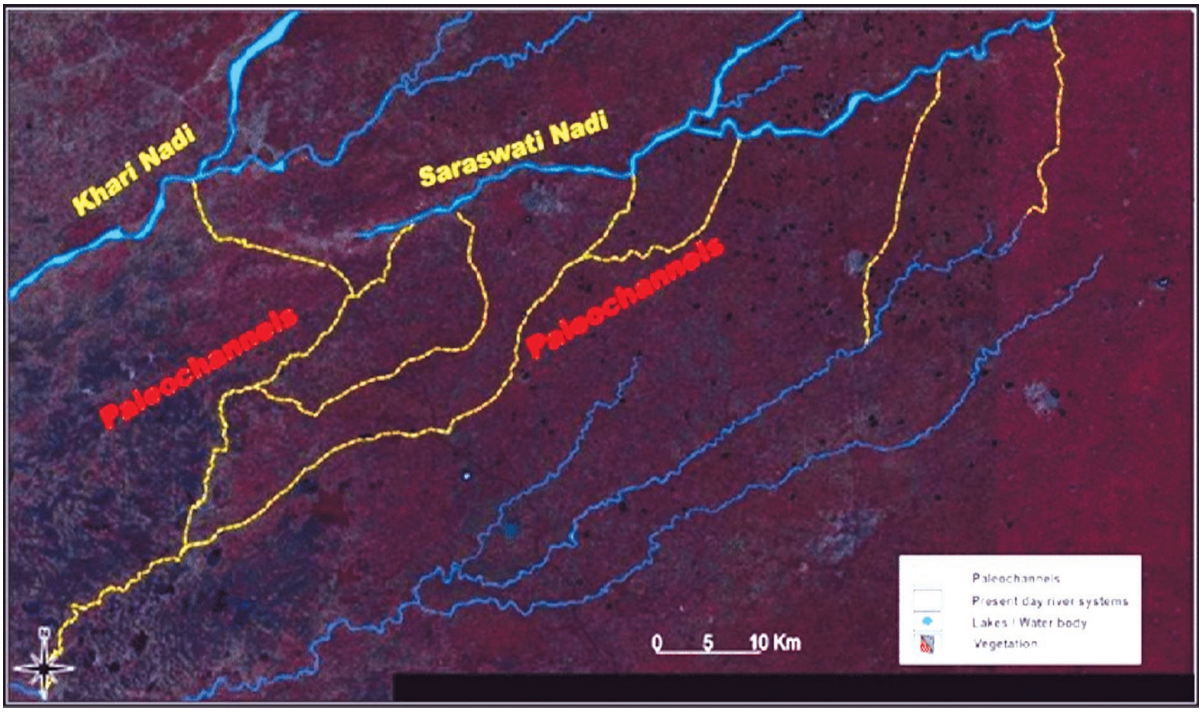

সরস্বতীর প্রাচীন নদীখাত

সঙ্গেই সরস্বতীর তুলনা করা যায় না। ৭০০০ থেকে ৬০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে সরস্বতী তার বিপুল আয়তন নিয়ে বয়ে যেত। সরস্বতীর জলের প্রধান উৎস ছিল হিমালয়ের বরফ গলা জল। যমুনা আর শতদ্রু হিমালয়ের বরফ গলা জল পৌঁছে দিত সরস্বতীতে। কিন্তু মানুষের জীবনের মতো নদীর জীবনেও অনেক উত্থান-পতন থাকে। আজ থেকে ৪, ৭০০ বছর আগে (খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ নাগাদ) ট্যাকটোনিক প্লেট বদলের (শিবালিক অঞ্চলে) কারণে যমুনা পূর্বদিকে সরে গিয়ে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়। সরস্বতীতে হিমালয়ের বরফ গলা জলের ঘাটতি দেখা দেয়। তারপর ১৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ ওই একই কারণে শতদ্রুও পশ্চিমে সরে গিয়ে সিন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়। বরফ গলা জলের সব উৎস বন্ধ হয়ে যায়। সরস্বতীর সম্বল বলতে তখন শুধু বৃষ্টির জল। কিন্তু ঠিক এই সময়েই বৃষ্টিপাতও মারাত্মক ভাবে কমতে শুরু করল। আবহাওয়া হয়ে পড়ল শুকনো। সরস্বতীর ফিরে আসার কোনও পথই রইল না। নদীর উত্তরাংশ পরিণত হলো কয়েকটি ছোটো ছোটো হ্রদে। আর জয়শলমীরের পর সরস্বতী হারিয়ে গেল মাটির নীচে। মহাভারতে বলরামের সরস্বতীর তীর বরাবর তীর্থযাত্রার উল্লেখ আছে। বলরাম বিনাশনা তীর্থের (অধুনা রাজস্থানের অনুপগড়) কাছে সরস্বতীর পরিবর্তে হ্রদ দেখেছিলেন। সাম্প্রতিক ভূতাত্ত্বিক তথ্যপ্রমাণেও আমরা তাই দেখছি। মোদ্দা কথা হলো, সরস্বতী

সোমরসের দেবী (হরপ্পা)

শুকিয়ে যাবার কারণে তীব্র জলসংকট দেখা দেওয়ায় সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের লোকেরা তখন পালাতে শুরু করেছে।

এই ঘটনা ঘটেছিল ১৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ। আর এখানেই রয়েছে সেলডম পোলকের যুক্তির সব থেকে বড়ো ফাঁক। কারণ তিনি দাবি করছেন মেসোপটামিয়া থেকে কৃষি বিশেষজ্ঞরা এই অঞ্চলে এসেছিল ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ, অর্থাৎ সরস্বতী শুকিয়ে যাবার প্রায় ৪০০ বছর পর। কিন্তু তারা কৃষিকাজ শেখানোর জন্য এমন একটি জায়গায় কেন যাবেন যেখানে তীব্র জলসংকট দেখা দিয়েছে এবং জলের খোঁজে যেখানকার লোক পালাতে শুরু করেছে অথবা বেশিরভাগই পালিয়ে গেছে? এখানে আসার আগে তারা কি খোঁজখবর নিয়ে আসেনি? মেসোপটামিয়া থেকে ভারত অনেকটাই দূরে— আসার সময় রাস্তাঘাটেও তো এত বড়ো বিপর্যয়ের খবর পেয়ে যাবার কথা! আসলে দোষ একা সেলডম পোলকের নয়। ম্যাক্সমুলার যে কারণে আর্য আক্রমণ তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন, পোলকও একই কারণে আর্য অভিবাসনের তত্ত্ব আউড়াচ্ছেন। আর্য মানে যে শ্রেষ্ঠ, সে খবর এখন সারা বিশ্ব জেনে গেছে। তাই

ভারতের মতো একদা ব্রিটিশ কলোনি একটা দেশ প্রকৃত আর্যভূমি হতেই পারে না। কিন্তু ভারত যদি না হয় তবে কোথায় সেই আর্যভূমি? অবশ্যই সেখানে, যেখানে পৃথিবীর তিনটি অ্যাব্রাহামিক রিলিজিওনের (খ্রিস্টান, ইসলাম ও ইহুদি) উৎপত্তি হয়েছিল। অর্থাৎ মধ্য এশিয়ায়। সেই জন্যেই ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ ও কমিউনিজমের সাইকোলজিকাল স্লেভে পরিণত হওয়া ঐতিহাসিকেরা মেসোপটামিয়ান সভ্যতাকে পৃথিবীর সব মানব সভ্যতার আদি জননী বলে অ্যাজেন্ডা তৈরি করছেন। বাইবেলের কালপঞ্জিকে চরম ধরে নিয়ে ভারতীয়দের সভ্য করে দেবার কৃতিত্ব দিতে চাইছেন মেসোপটামিয়ার কৃষিজীবীদের। আর তার সময় নির্ধারণ করছেন ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ যাতে মধ্য এশিয়ায় প্রাচীনত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে।

বস্তুত সপ্তসিন্ধু অঞ্চল হলো পৃথিবীর সব প্রাচীন সভ্যতার জননী। মেহেরগড় (এখন পাকিস্তানে) থেকে পাওয়া পুরাতাত্ত্বিক তথ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। মেহেরগড়ে আদি, মধ্য ও পরিণত সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতার নিদর্শন রয়েছে। এখানে পাওয়া গেছে পৃথিবীর প্রাচীনতম কৃষিভূমি। সেই ভূমিতে এখনও লেগে আছে লাঙলের ফলার দাগ। এখানকার লোক যব ও বার্লি চাষ করতে পারত। তারা ভেড়া ও ছাগলকে পোষ মানাতেও শিখেছিল। সব থেকে বড়ো কথা, সভ্যতার প্রতিটি স্তর এরা অতিক্রম করেছিল। অর্থাৎ এখানে প্রাচীন প্রস্তরযুগ থেকে শুরু করে নব্য ও মধ্য প্রস্তরযুগ এবং তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগ পর্যন্ত একটা ধারাবাহিকতা দেখতে পাওয়া যাবে। মানব সভ্যতার এমন ধারাবাহিক বিবর্তনের সাক্ষ্য বিশ্বের আর কোথাও এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কেবলমাত্র মেহেরগড় থেকে পাওয়া তথ্যাদি বিশ্লেষণ করলে একটা কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে এখানে কৃষির উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছিল সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। বিশ্বের অন্যান্য সভ্যতার ক্ষেত্রেও কথাটা একই ভাবে সত্যি। কেউ কাউকে চাষাবাদ করতে শেখায়নি। কারণ সেটা সম্ভব নয়। কৃষিকাজ স্থানীয় আবহাওয়া ও মাটির চরিত্রের ওপর নির্ভরশীল। মেসোপটামিয়া ও সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের মাটি আলাদা, আবহাওয়া আলাদা--- তাই চাষাবাদের প্রযুক্তি ও কৌশলও আলাদা হবে।

সুতরাং সেলডম পোলকের দাবি অনুযায়ী মেসোপটামিয়াকে 'আর্য'দের প্রকৃত হোমল্যান্ড হিসেবে মেনে নেওয়া দুষ্কর। মেসোপটামিয়া থেকে কৃষিজীবীদের একটি দল সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে এসেছিল, এখানকার মানুষকে চাষাবাদ শেখাতে— পোলকের এই দাবির মধ্যেও কোনও সারবত্তা নেই। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। মেসোপটামিয়া থেকে কোনও অভিবাসন যদি না হয়ে থাকে তাহলে ভারতে যে হ্যাপলো গ্রুপ (R1a 1a) পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে মধ্য এশিয়া, সিরিয়া ও ইউরোপের হ্যাপলো গ্রুপ এক হয় কী করে? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবার জন্য আরও গবেষণার প্রয়োজন। এই মুহূর্তে আমাদের কাছে যা তথ্য আছে তাই দিয়েই আমরা উত্তর দেবার চেষ্টা করব। শতপথ ব্রাহ্মণে 'অমাবসু' নামের এক ব্যক্তির উল্লেখ আছে। সরস্বতী নদী শুকিয়ে যাবার পর সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে তীব্র জলসংকট দেখা দেওয়ায় এই অমাবসু পূর্বদিকে (গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলে) স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। সংহিতা গ্রন্থাবলী থেকে জানা যাচ্ছে সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের লোকেরা শুধু পূর্বদিকেই নয়, উত্তরদিকেও যাত্রা করেছিলেন। উত্তরদিক মানে ইরান, ইরাক, মধ্য এশিয়া এবং তারপর সম্ভবত ইউরোপ। সুতরাং ভারত ও মধ্য এশিয়ার হ্যাপলো গ্রুপের সাদৃশ্যের ব্যাখ্যা আমরা শতপথ ব্রাহ্মণ ও সংহিতার মাধ্যমে দিতে পারি। এবং এই হাইপোথিসিস অযৌক্তিকও হবে না। কারণ বাণিজ্যিক কারণে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার কথা চার বেদেই আছে। সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতার লোকেদের সঙ্গেও মেসোপটামিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। সুতরাং সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের লোকেরা, বিশেষ করে বণিকেরা যারা বাণিজ্যের কারণে নিয়মিত মেসোপটামিয়ায় যাতায়াত করতেন এবং টাইগ্রিস- ইউফ্রেতিস অববাহিকার সভ্যতার নাড়িনক্ষত্র সম্বন্ধে যারা অবগত ছিলেন, অন্তত সেই বিশাল বণিক গোষ্ঠী যদি সরস্বতী শুকিয়ে যাবার পর নতুন বাসস্থানের খোঁজে উত্তর দিকে যাত্রা করেন, তাহলে অবাক হবার কিছু নেই। বরং এটাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এবং তাদের মাধ্যমে মধ্য এশিয়া ও ইউরোপে সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের হ্যাপলো গ্রুপ ছড়িয়ে পড়াও স্বাভাবিক মনে হয়। এই যুক্তি আরও শক্তপোক্ত হয়েছে ড. নীরজ রাইয়ের সাম্প্রতিক গবেষণায়। ভারতের খ্যাতিমান জিন বিজ্ঞানী আমাদের জানিয়েছেন, বিশ্বের প্রাচীনতম হ্যাপলো গ্রুপের সন্ধান মিলেছে এই ভারতেই, যার বয়স ১৫,৪৬০ বছর। অর্থাৎ ভারতই যে প্রাচীন আর্যভূমি এবং এখান থেকেই যে হ্যাপলো গ্রুপ R1a 1a ছড়িয়ে পড়েছিল মধ্য এশিয়া-সহ ইউরোপের অনেক জায়গায় সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ আর নেই বললেই চলে।

ভারতীয় সভ্যতার সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা দেখলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। এই ধারাবাহিকতা প্রমাণ করে গ্রিস, রোমান, ইজিপ্ট ও মেসোপটামিয়ার মতো ভারতীয় সভ্যতা ধ্বংস হয়নি। বৈদিক সংস্কৃতির বিবর্তিত রূপ হিন্দুধর্মের মাধ্যমে আজও বেঁচে আছে ভারতের প্রতিটি কোণে। সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের মেয়েরা যেমন বিয়ের পর সিঁথিতে সিঁদুর পরত, এখনও হিন্দু মেয়েরা পরে। আজও রয়ে গেছে মেয়েদের চুড়ি বা বালা এবং কপালে টিপ পরার রেওয়াজ। সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতার মহেঞ্জোদরোতে বারোটি যোগাসন ও প্রাণায়াম রত পুরুষের টেরাকোটা মূর্তি পাওয়া গেছে। রাখিগড়িতে ৭০০০ বছরের পুরোনো বাড়ির বাথরুমে মোজাইক টাইলস ও কমোড পাওয়া গেছে। মহেঞ্জোদাড়োর স্নানাগারের পাশে ছোটো ছোটো বিশ্রামকক্ষ নির্মাণ করানো হয়েছিল। সেখানে ছিল গরম ও ঠাণ্ডা জলের জন্য আলাদা পাইপ। অনেকে বলেন এখানে টার্কিশ বাথ নেবার ব্যবস্থা ছিল। এসব এখনও ভারতে আছে। থাকবেও। সরস্বতী নদী শুকিয়ে যাবার পর ৪০০০ বছর ধরে ভারতীয়রা তাকে স্মৃতিতে বাঁচিয়ে রেখেছে। সুতরাং সেলডম পোলকরা যাই বলুন, হাজার হাজার বছরের এই ধারবাহিকতা দেখে মাথা আপনা থেকেই নত হয়ে আসে, নিজেকে ভারতীয় ভাবতে গর্ব হয়। □

উপভাষাগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার প্রধান উপায় তার চর্চা বাড়ানো। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্থানীয় বাংলা উপভাষার নিয়মিত চর্চার ব্যবস্থা করা।

মাতৃভাষা ও উপভাষা, বিশের প্রেরণা

বর্ণিক চ্যাটার্জি

বাংলার মূল উপভাষা পাঁচটি। রাঢ়ী, গাঙ্গেয়, বরেন্দ্র, বঙ্গালি, সুন্দরবনি। তবে তার বাইরেও আছে অগুনতি। যদিও বাংলা ভাষার এই বিবিধতা নিয়ে শিক্ষিত বাঙ্গালির সেরকম মাথাব্যথা নেই। বরং শুদ্ধ বাংলা কী হবে তা নিয়ে বহুকাল বাঙ্গালিদের মধ্যে তর্কবিতর্কের কোনও শেষ নেই। ইংরেজরা যখন ভারত শাসন করতে মনস্থ করে তাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল বাঙ্গলা তথা কলকাতা। এই বাঙ্গলার প্রচলিত ভাষা শাসক শ্রেণীকে শেখাতে বেশ কিছু শিক্ষাকেন্দ্র চালু করা হয় কলকাতায়। সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেই প্রথম শুরু হয় গদ্য বাংলাতে ছাত্রবোধ্য লেখালিখি যা পরবর্তীকালে শুদ্ধ বাংলা হিসেবে প্রচার করা হয় বাকি বাঙ্গলা জুড়ে। তখন বাংলা ভাষার বিস্তার পশ্চিমে বিভিন্ন রকম ছিল। ফলে এক অঞ্চলের বাঙ্গালি অন্য অঞ্চলের বাঙ্গালির মুখের ভাষা ভালো ভাবে বুঝতে পারতো না। তবে এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। কারণ বিশালাকার যে কোনো জাতির ভাষাতেই এরকম সমস্যা থাকে। একই জাতি এবং একই ভাষার মানুষ হয়েও এক অংশের সঙ্গে আরেক অংশে এই ধরনের ব্যবধান চিরকাল ধরেই হয়ে আসছে। উদাহরণস্বরূপ ইংরেজি ভাষার কথা বলা যায়। আমেরিকান ইংরেজি অস্ট্রেলিয়ার মানুষ বোঝে না, আবার ইংল্যান্ডের ইংরেজি আমেরিকার মানুষ বুঝতে পারে না। এমনকী ইংল্যান্ডের মানুষদের ইংরেজি তাদের পার্শ্ববর্তী স্কটল্যান্ড, ওয়েলসের মানুষরাও বোঝে না। অথচ ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস সকলেই কিন্তু ইউনাইটেড কিংডম নামে একই দেশের অন্তর্ভুক্ত। এই না বোঝা নিয়ে পারস্পরিক কিছু হাসি ঠাট্টারও চল রয়েছে।

বাংলা ভাষায় ব্যাপারটা আরও একটু আলাদা। যেহেতু শান্তিপুর কেন্দ্রিক বাংলা ভাষা 'শুদ্ধ বাংলা' হিসেবে মান্য হওয়ার ফলে বাংলা সাহিত্য, সংগীতের বেশিরভাগ রচনাই হয়েছে শান্তিপুরী বাংলায়। আবার ঊনবিংশ শতকের শুরু থেকেই শহর কলকাতা যে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে ওঠে। এখানে সারা বাঙ্গলা তথা পূর্ব ভারত থেকে অভিজাত বংশীয়রা তাদের সন্তানদের পাঠাতে থাকে ভালো মানের শিক্ষা লাভের আশায়। এদের মধ্যে শুদ্ধ বাংলায় কথা বলার একটা প্রবণতা ছিল। এ সময় বাইরে থেকে আগত ছাত্রদের একটা বড়ো অংশ আসত পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন এলাকা যেমন ঢাকা বা ময়মনসিংহ থেকে। এই ছাত্রদের মুখের ভাষায় পূর্ববঙ্গীয় টান থাকায় তারা হয়ে ওঠে কলকাতাবাসী ছাত্রদের কাছে এক উপহাসের পাত্র, 'বাঙ্গাল'। এই উপহাসরত সহপাঠীদের থেকে বাঁচাতে এদের অনেকেই তাদের নিজস্ব বাংলার স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে রাতারাতি শান্তিপুরী বাংলা বলা শুরু করে এবং অতি দ্রুত কলকাতার ভিড়ের সঙ্গে মিশে যেতে থাকে। সে যুগে 'বাঙ্গাল' হওয়াটা যে কতখানি অপমানজনক ছিল তার প্রমাণ বাংলা সিনেমা, সাহিত্যের বহু জায়গায় রয়েছে।

দাড়িভিটের ভাষাবীর— রাজেশ ও তাপস।

গল্পে বাঙ্গাল চরিত্রগুলো থাকতই যেন হাসির খোরাক হবার জন্য। 'বাঙ্গাল' কথাটা ব্যবহার করা হতো প্রায় একটা গালাগাল হিসেবে। তবে মজার বিষয় হলো, যে সব কলকেতিয়া ছেলেরা পূর্ব বঙ্গীয়দের 'বাঙ্গাল' বলে খেপাত, তাদের নিজেদের বাংলাও শুদ্ধ ছিল না। তখন কলকাতা শহরে বাঙ্গালি থাকত মূলত উত্তর কলকাতায়। আর উত্তর কলকাতার বাংলা ছিল 'ল'-কে 'ন' বলা বাংলা। লুচি-লেবু-লঙ্কাকে যারা নুচি-নেবু-নঙ্কা বলত, তারাই আবার অন্যদের বাংলা উচ্চারণ শুনে জোরে জোরে হাসত।

তবে এরও একদিন বদল ঘটল। বিংশ শতকের মাঝামাঝি ভারত স্বাধীন হয়। তার সঙ্গে বাঙ্গলা ভাগ হয়ে যায় ধর্মীয় মতভেদের কারণে। এর ফলে স্বাধীনতার পরে পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দুদের এক বড়ো অংশ পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে থাকে। বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে তারা বসতি গড়ে তোলে কলকাতা ও কলকাতা সংলগ্ন অঞ্চলে। এইসব পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষজন এক-দুই প্রজন্মের মধ্যেই মিশে যেতে থাকে প্রাচীন পশ্চিমবঙ্গবাসীদের সঙ্গে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলীর বাঙ্গালিরা মিলে গড়ে তোলে এক শহুরে বাংলা ভাষা, যার শিকড় পুরোটাই শান্তিপুরী। এই নব্য বাংলা ধীরে ধীরে পূর্ববঙ্গীয়দের কাছেও শুদ্ধ বাংলার মর্যাদা পেতে থাকে। তারা ধীরে ধীরে ভুলে যেতে থাকে তাদের স্বকীয়তা এবং তাদের পূর্ববঙ্গীয় উপভাষা।

বর্তমানে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা অনেকেই হয়ে উঠেছেন শান্তিপুরী শুদ্ধ বাংলার প্রধান ধারক ও বাহক। এদের সম্মিলিত আক্রমণের লক্ষ্য এখন মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার বাঙ্গালিরা। মেদিনীপুরের মানুষদের এখন কেউ কেউ বলেন টুম্পা। Tumpa অর্থাৎ Typically Uncultured Midnapori People's Association। সেই তুলনায় পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার মানুষদের ভাগ্য কিছুটা ভালো। হ্যাটা হতে হলেও টুম্পার মতো এরকম কোনো ডাকনাম তারা এখনও পাননি। এসব অঞ্চলের মানুষদের অন্য রকম বাংলাকে চরম ভাবে হ্যাটা করে আসলে তারা বাংলা ভাষাকেই অপমান করছে। তারা ভুলে যেতে চাইছে মানভূমের বাঙ্গালিদের বাংলাভাষা রক্ষা করার গৌরবময় আন্দোলনের ইতিহাস। মানভূম ভাষা আন্দোলন বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার প্রথম লড়াই। যার জেরেই পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। উত্তরবঙ্গীয় বাঙ্গালিদেরও কলকাতায় এলে একই অবস্থার শিকার হতে হয়। বরাক উপত্যকা ও ত্রিপুরার বাঙ্গালিদের কথা তো ছেড়েই দিলাম। উত্তর-পূর্ব ভারতে বাঙ্গালিরা এক সময় সমস্ত প্রধান পদে বহাল ছিল। তারা এখন সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে শুধু ইতিহাসের পাদটীকা হয়ে ফুটকির মতো ঝুলে আছে। এটা খুবই আশ্চর্যজনক, যে পূর্ববঙ্গীয়রা মাত্র কয়েক দশক আগে কলকাতায় একই রকম উপহাসের শিকার হয়েছিল তারা এত দ্রুত সেসব ভুলে গিয়ে অন্যদের 'টুম্পা' কিংবা 'বাঁকড়ি' বলে ঠাট্টায় মেতে উঠতে পারে। একথা আবার মনে করিয়ে দেয়, বাঙ্গালি এক আত্মবিস্মৃত জাতি।

বিশে সেপ্টেম্বর সব ভুলে জেগে ওঠার দিন। এটা শুধু গর্ব ভরে বাংলা বলার দিন নয়, নিজের মতো করে নিজস্ব বাংলা বলার দিন। আমরা ভাষাবীর হিসেবে রাজেশ তাপসের কথা পড়ব, ভাবিনী মাহাতো, অতুল্য ঘোষের কথা জানব অথচ তারা কোন বাংলায় কথা বলতেন, কেমন ছিল তাদের বাংলা ভাষা, সেটা জানতে চাইব না?

বাংলা ভাষা সবকটি উপভাষার সমন্বয়ে সৃষ্টি কেবলমাত্র একটি উপভাষা প্রধান এবং বাকিগুলিকে উপহাসের পাত্র বানানো বাংলা ভাষীদের জন্য সুখবর নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, বাংলা ভাষা রক্ষার জন্য কোনো আন্দোলন কলকাতা শহরে হয়নি, তা হয়েছিল মানভূমের মালভূমি অঞ্চলে, অবিভক্ত শ্রীহট্টের অংশ বরাক উপত্যকায় আর অতি সম্প্রতি দক্ষিণ দিনাজপুরের ইসলামপুরের কাছে দাড়িভিটে। এই সমস্ত উপভাষা এবং তার আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে রক্ষা আমাদের আশু কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এখনও বাংলাতে বিভিন্ন উপভাষায় কথা বলার মতো লোকজন বেঁচে আছে বলে আমরা এই অবক্ষয় ধরতে পারছি না। কিন্তু এ অবস্থা দ্রুত খারাপের দিকে। বাংলা ভাষার বিশ্বায়নের কারণে কমবয়সিরা স্থানীয় বাংলা পরিত্যাগ করছে এবং তারা মনে করছে ইউটিউব বা অন্য ভিডিয়ো প্লাটফর্মে বলা ভাষাই একমাত্র বাংলা ভাষার প্রতিনিধি। আমাদের চেষ্টা করা উচিত এ অবস্থার পরিবর্তন করা এবং প্রান্তিক মানুষদের মধ্যে তাদের নিজের স্থানীয় বাংলায় মন খুলে কথা বলার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা। আমাদের এই বিভিন্নতার মধ্যেই ঐক্য ধরে রেখেছে আমাদের ভাষা বাংলা, যা এখনো তার স্বকীয়তা ধরে রেখে পৃথিবীতে প্রথম দশ সর্বাধিক কথিত ভাষার মধ্যে একটি। এছাড়াও যে কোনো ভাষার বিভিন্নতা তাকে অন্য ভাষার সঙ্গে দ্রুত বিলীন হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচাতে পারে। একারণেও আমাদের উচিত এই উপভাষাগুলিকে ধরে রাখা। উপভাষাগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার প্রধান উপায় তার চর্চা বাড়ানোর দিকে মন দেওয়া। বর্তমানে আমাদের প্রতিটি জেলাতে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হয়েছে। সেগুলিতে স্থানীয় বাংলা উপভাষা চর্চা শুরু করা উচিত। এর সঙ্গে বাংলা ভাষাবিদ হবার জন্য অন্তত বাংলার তিনটি উপভাষাতে পারদর্শী হওয়া বাধ্যতামূলক করা উচিত। এভাবে আমরা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কিছুটা হলেও এই উপভাষাগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার দিকে এগিয়ে রাখতে পারি। বিশের আসল প্রেরণা কিন্তু এটাই।

আমি চাই বাঙ্গালটা তার নিজের টানে।
বলবে কথা, জোর গলাতে কিংবা হঠাৎ, কানে কানে।
আমি চাই পুরুলিয়ার সেই ছেলেটা গিটার হাতে;
মানভূমি বাংলাতেই গাইবে ঝুমুর কলকাতাতে।
টুম্পা ডাক আর শুনবে না কেউ কোথাও থেকে।
বাংলা ভাসুক
উপভাষার তীব্র বেগে।
বাঁকড়ি কথা কেউ যেন না লুকিয়ে ফেলে।
সবাই যেন নিজের মতো বাংলা বলে।
ভাবতে পারো চাইছি সে এক স্বপ্ন রাজ্য।
বলছি আমি, হবেই হবে একদিন গ্রাহ্য।

আবার খয়রাতি

পশ্চিমবঙ্গের ৪৩ হাজার পূজা কমিটিকে ৬০ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করল মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সরকার। রাজ্যে অনেক সমস্যা আছে। আমার আপনার বাড়ির শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা টেট পাশ করেও চাকরি না পেয়ে কলকাতার রাজপথে বসে আছে। তারা চাকরি তো পেলেন না উলটে ওই চাকরি লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়ে এই সরকারের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী এবং তাঁর লোকজন টাকা, সোনা, ডলার, জমিজমা-বাড়ি ঘর ও ডজন খানেক বান্ধবী পুষে বর্তমানে জেলে। শিক্ষামন্ত্রীর দুর্নীতিতে সামান্যতম লজ্জাবোধ নেই মুখ্যমন্ত্রীর। যদি তা থাকতো তাহলে কলকাতার রাজপথে বসা বাঙ্গলার ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ক্ষমা চেয়ে তাদের পাওনা চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিতেন। না সামান্যতম লজ্জাবোধ নেই, তাই প্রত্যেক পুজো কমিটিকে ৬০ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। টাকা দিচ্ছেন। কার টাকা? নাম হবে দয়ালু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কেন এই ব্যবস্থা? বড়ো বড়ো পূজা কমিটির লোকজনকে হাতে করে জনগণের কল্যাণে কাজ না করে শুধু লুটপাট করে মন্ত্রী নেতারা টাকার পাহাড় বানিয়ে চলেছেন। এই জন্যই কি বীর বিপ্লবীরা আত্মবলিদানে আমাদের মাথা উঁচু করে দিয়েছেন। সেই বাঙ্গলার বড়ো বড়ো পূজা সংগঠকরা যে ভাবে একটা কলঙ্কিত সরকারের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে তারা কি আমাদের উঁচু মাথা নীচু করে কি দিচ্ছে না?

দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দান খয়রাতি ভারসাম্য বজায় রেখে করতে বলেন। তার পরেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কীভাবে খয়রাতির পরিমাণ বাড়িয়ে চলেছেন সেটাই চিন্তার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারে আসার আগে ৬০ বছরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঋণ ছিল প্রায় ১ লক্ষ ৬১ হাজার কোটি টাকা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার তার ১০ বছরে ঋণের পরিমাণ বাড়িয়েছে পূর্ব ঋণের প্রায় ৪ গুণ। সরকার আয় বাড়াতে পারেনি। দান খয়রাতি করে শুধু নাম কেনার চেষ্টা করে যাচ্ছে। সরকার কর প্রদানকারীর টাকা নিয়ে নিজের দলের তহবিল ভর্তি করতে পারে না। আয় করতে গেলে পরিশ্রম লাগে। হয়তো অপ্রিয় হতে হয়। সে দিকে না গিয়ে পরের ধনে পোদ্দারি করে চলেছে। খুব ভালো করেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন এভাবে বেশিদিন চলবে না।

দিল্লি মমতার অধরাই থেকে যাবে। তার স্বপ্ন কখনোই বাস্তব হবে না। ইডি ও সিবিআই যে ভাবে আদালতের নির্দেশে সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের চেপে ধরেছে তাকে আড়াল টিএমসি সরকার করতে পারবে না। প্রতিদিন যেভাবে সরকারের নানান কেলেঙ্কারির লোমহর্ষক কাহিনি বেরিয়ে আসছে তা খুব শীঘ্রই টর্নেডোতে পরিণত হবে। বর্তমানে টিভির সংবাদ দেখার দর্শক এই কারণেই প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। যত মানুষ সংবাদ দেখবে ততই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভিত নড়বড়ে হয়ে পড়বে। এই ভাবেই পশ্চিমবঙ্গের পাপ মোচন হবে।

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

বঙ্গ গণতন্ত্রে অন্তঃসলিলা রাজতন্ত্র

এই পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব তমসাচ্ছন্ন হলেও বর্তমান মানব সভ্যতা শিক্ষা ও চেতনায় রাজতন্ত্রের প্রায় অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্রের অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে। কিন্তু বঙ্গ গণতন্ত্র কি সত্যই অন্তঃসলিলা রাজতন্ত্র? ৩৪ বছর টিকে থাকা বাম সরকারের পতন ঘটিয়ে বর্তমানে সরকারে অধিষ্ঠিত টিএমসি। এই সরকারকে গৌরবময় বলে রাজনৈতিক ভাবে তুলে ধরা হয়েছিল। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি বিরাট আকারে শহরের প্রায় সব রাস্তার চৌমাথায় সুশোভিত থাকত এবং লেখা থাকতো 'সততার প্রতীক'। মানুষের মনে একটা শান্তি ফিরে এসেছিল একথা বলতেই হবে। কারণ হিসেবে বলতেই হয় বামফ্রন্টের দুর্নীতি ও অত্যাচার মানুষের মনে সরকার পরিবর্তনের ইচ্ছেকে তীব্র করে তুলেছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের আগমন মানুষের সরকার পরিবর্তনের ইচ্ছাকে পূর্ণ করছে এটাও সত্য।

সময়ের গতিতে বর্তমান সরকারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সেই গয়ায় যারা পিতা-মাতার পিণ্ডদানে ফাল্গুনী গঙ্গা নদীতে বালির নীচে চোরা স্রোত দেখেছেন, সেই ভাবে দুর্নীতির চোরাস্রোত একই ভাবে প্রবাহিত। আগে জনগণের সেবা বিমুখ রাজার টাকার পাহাড়, হাজার রানির রাজপ্রাসাদ— এসব যেন বর্তমানে প্রত্যক্ষ করছে এ রাজ্যের মানুষ। আলোচনা প্রসঙ্গে বর্তমান সভ্যতায় গণতন্ত্র রক্ষা করতে পারে বিচার ব্যবস্থা, আইন আদালত। সর্বোপরি জনগণ। গণতন্ত্রের মানস পুত্র আমেরিকার আব্রাহাম লিংকন গণতন্ত্রই যে শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন মানব জাতির সামনে। এখন রাজতন্ত্রের চোরাস্রোত রক্ষা করছে বর্তমান রাজনীতিকরা।

—রবীন্দ্রনাথ রায়,
প্রথম খণ্ড, শিয়ালদহ, রাশিডাঙ্গা-২,
কোচবিহার।

পিএমএলএ : বর্তমান আইনে সিলমোহর শীর্ষ আদালতের

অবসরের ঠিক দুই দিন আগে শীর্ষ আদালতের তিন সদস্যের বেঞ্চের প্রধান বিচারপতি খান উইলকর ৫৪৫ পাতার রায়ে ইডির ক্ষমতা ও কার্যপদ্ধতির বিরুদ্ধে আনীত বিরোধী দলের সমস্ত অভিযোগ নস্যাৎ করে বর্তমান আইনকেই সিলমোহর দিলেন। শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, পিএমএলএ বা আর্থিক তছরূপ আইন বর্তমান অবস্থায় কোনোভাবে সংবিধান বহির্ভূত নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, এই আইন অনুযায়ী সমাজের কোন ধরনের মানুষ এতে যুক্ত? এই আইন থাকুক বা না থাকুক সাধারণ মানুষের কিছু যায় আসে না। সুতরাং কোনো সাধারণ মানুষ এই বিষয়ে মামলা দায়ের

করেনি। মামলা দায়ের করেছে রাজনৈতিক প্রভাবশালীরা। বিভিন্ন সময়ে তারা অনৈতিকভাবে বেআইনি টাকা লেন-দেনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন। তার জ্বলন্ত উদাহরণ হলো পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চাশ কোটি টাকা, বৈদেশিক মুদ্রা সহ-কয়েক কোটি টাকার সম্পদ। জড়িয়েছে রাজ্যের অত্যন্ত প্রভাবশালী মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ভিতরে বাইরে প্রচণ্ড চাপে অত্যন্ত অনীহা সত্ত্বেও তাঁকে ছেটে ফেলেছেন মমতা ব্যানার্জি। এখন দেখা প্রয়োজন কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং কাদের স্বার্থে আঘাত করছে এই আইন। এই আইনের অধীনে যাদের বিরুদ্ধে ইডি মামলা বা জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে তারা সকলেই বিরোধী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত। ইডির মামলায় জর্জরিত হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক পক্ষপাতের জিগির তুলছে।

এই ইডির মামলায় জড়িয়েছেন অত্যন্ত প্রভাবশালী ইউপিএ সরকারের অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরম, কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি, শিল্পপতি শিবেন্দর মোহন সিংহ, উদ্ধব ঠাকরে সরকারের এনসিপি-মন্ত্রী নবাব মালিক। এরা সবাই বেআইনি অর্থ লেন-দেনের সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ। ইডির তদন্তে নবতম সংযোজন হলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ইডি, সিবিআইয়ের তদন্তে দীর্ঘসূত্রিতার অভিযোগ বিভিন্ন মহলের। আর এটাকেই রাজনৈতিক দলগুলো হাতিয়ার করে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিয়ে থাকে। আসলে এই দীর্ঘসূত্রিতার অন্যতম কারণ হলো আদালতে মামলা। ইডির অনেক মামলা, তাতে অনেক প্রভাবশালী জড়িয়ে। তাই মামলা থমকে আছে শীর্ষ আদালতের রায়ের অপেক্ষায়। এখন আদালতের এই রায়ে ইডির তদন্তের শক্ত হলো। এবার এইসব মামলা গতি পাবে বলে মনে হয়। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি-সহ নির্বাচনোত্তর হত্যার প্রায় সব মামলায় জড়িত শাসক দলের নেতা-নেত্রীরা। সব মামলায় আদালত সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। শাসক দলের অভিযুক্তদের ডাকলেই অসুস্থতার ভান করে হাসপাতালে ভর্তি হয়। নতুবা সিঙ্গল বেঞ্চে হেরে গিয়ে ডিভিশন বেঞ্চ, আবার সেখানেও সুবিধা না হলে শীর্ষ আদালতে মামলা নিয়ে যায়, তাতেই তদন্ত প্রলম্বিত হয়। গত ২৭ জুলাইয়ের শীর্ষ আদালতের রায়ে অসন্তুষ্ট দেশের প্রধান বিরোধী দল। সম্প্রতি ইডির প্রশ্ন বাণে জেরবার তাদের শীর্ষতম নেতৃত্ব। ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় বেশ কয়েকবার সওয়ালের মুখোমুখি হয়েছেন সোনিয়া, রাহুল গান্ধী। জেরা এখনো শেষ হয়নি। আগামীদিনেও জেরা হতে পারে এবং তার পরিণতি আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। আদালত পর্যন্ত মামলা গড়ালে তার পরিণাম কী হতে পারে কেউ জানে না। তাই কংগ্রেসের ছোটো বড়ো নেতা শঙ্কিত। মামলা যদি ২০২৪-এর আগে আদালতের দুয়ারে যায় তবে দলের অস্তিত্ব কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কেউ বলতে পারবে না।

পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল এতদিন রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কথা আউড়ে এলেও পার্থ-কাণ্ডের পর ইডি নিয়ে মুখে কুলুপ। তদন্ত কোথায় পৌঁছে যায় এবং পরিণতি শীর্ষ নেতৃত্ব পৌঁছে যায় কিনা তা এখন সময়ের অপেক্ষা। রায় দানকালে শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ উল্লেখযোগ্য। আদালত বলেছে— Laundering no less heinous an offense than terrorism। অর্থাৎ আর্থিক তছরূপ কোনোমতেই সন্ত্রাসবাদের থেকে কোনো ভাবে কম নয়। আদালতের এই ভাবুন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে আর্থিক তছরূপ কোনোমতেই সন্ত্রাসবাদের থেকে কোনো ভাবে কম নয়। আদালতের এই রায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে আর্থিক তছরূপের অনেক অর্থ সন্ত্রাসের কাজে এসেছে, তার নজির আছে। রায় দানের সময়ে আদালত আরও বলেছে— If there are any proactive towards such a cause, we cannot facilitate the good step। দেশের অখণ্ডতা নিয়ে আলাদত কতটা চিন্তিত তা স্পষ্ট। এখন দেখা যাক আইনে কী আছে যা চিন্তায় রেখেছে তামাম বিরোধী দলকে। এই আইনে বলা হয়েছে, (১) ইডির তরফে কাউকে গ্রেপ্তারের আগে অভিযুক্তকে কারণ দর্শানোর দরকার নেই, (২) ইডি তদন্ত শুরু করার আগে যে ইসিআইআর (enforcement case information report) দায়ের করে তা দেখাতে হয় না। (৩) যেটা অভিযুক্তদের ভাবাচ্ছে যে একবার মামলা দায়ের হলে অভিযুক্তদের নির্দোষ প্রমাণের দায় তাদের এবং আদালতকে মুচলেকা দিতে হবে যে তারা এমন কাজ আর করবে না। এই রায় যেমন কেন্দ্র সরকারের শ্লাঘার কারণ, তেমনই বিরোধী নেতার কপালের ভাঁজ পড়েছে। ইডির সামনে যখন আর আইনের বাধা নেই, তারা তদন্ত ত্বরান্বিত করে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করবে, তাহলেই তারা তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ থেকে মুক্তি পাবে।

—তারক সাহা,
হিন্দমোটর, হুগলী।

প্রতিবাদী চাকরি প্রার্থীরা

প্রাক্তন শিক্ষা ও শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের শিক্ষা ও শিল্পের মৃত্যুঘন্টা বাজিয়ে ছেড়েছেন। তিনি এখন কোটি কোটি টাকা প্রতারণার দায়ে শ্রীঘরে। তাঁর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায় তারই দোসর। মহাজন গত সঃ পন্থা— মহাজনেরা যে পথে গেছে সেই পথকে আদর্শ করে তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবীও এখন জেলে। বিভিন্ন আবাসন থেকে তাদের দুজনের কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে। টাকার পাহাড়ের পরিমাণ কত তা জানতে টাকা গোনার মেশিন আনতে হয়েছিল ইডিকে। যে পরিমাণ দুর্নীতি ও আর্থিক তছরূপ হয়েছে, তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরলতম ঘটনা। এখন প্রশ্ন হলো, প্রতিবাদী চাকরি প্রার্থীদের প্রতিবাদের সুরাহা কীভাবে হবে? লক্ষ লক্ষ বেকার চাকরি প্রার্থীদের চোখের জল, তাদের চাকরির জন্য হাহাকার— এর প্রতিকারের সমাধান কী? বর্তমান সরকার এরাজ্যের শিক্ষা ও শিল্পকে অন্ধকারের শেষ প্রান্তে নিয়ে গেছে। প্রতিবাদী চাকরিপ্রার্থীরা তাঁদের যোগ্যতার একটি চাকরি যা তাঁদের প্রাপ্য, তাঁদের নিজস্ব ভবিষ্যৎ, সেটাই এখন হতাশার চোখের জল।

—সঞ্জয় ব্যানার্জী,
চুঁচুড়া, ব্যারাক রোড, হুগলী।

শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ—একথা শুধুই খাতাকলমে

মাধবী মুখার্জী

শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ একথা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে শিশুরা আজও অবহেলিত। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের (১৯৬৯) প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও আজও সমস্যার সমাধান হয়নি। রাষ্ট্রসঙ্ঘের ঘোষণা মতো শিশুর মূল অধিকার হলো—

প্রতিটি শিশুর একটি নির্দিষ্ট নাম ও জাতিগত পরিচয় পাবার অধিকার। স্নেহ ভালোবাসা সহানুভূতি ও মমতাপূর্ণ পরিবেশে মানুষ হবার অধিকার। অবহেলা, শোষণ ও নিষ্ঠুরতা থেকে রক্ষা পাবার অধিকার। প্রতিভা বিকাশের ও সমাজে যোগ্যস্থান পাবার অধিকার। যে কোনো বৈষম্যের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া এবং বিশ্বশান্তি ও সৌভ্রাতৃত্বের মানসিকতা নিয়ে গড়ে ওঠা। সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা, পর্যাপ্ত পুষ্টি, সুচিকিৎসার ব্যবস্থা, বাসস্থান ও আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী ও লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রতিটি শিশুর সমানাধিকার। বিপর্যয়ের সময় সর্বপ্রথম সাহায্য পাবার অধিকার। প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ শিক্ষা, চিকিৎসা ও পরিচর্যার ব্যবস্থা। স্বাধীনতা ও মর্যাদার সঙ্গে সুস্থদেহে স্বাভাবিক বেড়ে ওঠার জন্য বিশেষভাবে সুরক্ষিত সুযোগ সুবিধাগুলো।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের সমীক্ষায় জানা যায় যে, ভারতে শিশুর সংখ্যা বর্তমানে ২৫ কোটি ৭০ লক্ষ। এদের মধ্যে ৪০ শতাংশ শিশু চরম বঞ্চনার শিকার। দেশের দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারের শিশুরা চরম অপুষ্টির মধ্যে বেড়ে ওঠে তাদের শিক্ষার আলো থেকেও বঞ্চিত করা হয়। বিপুল সংখ্যক শিশুশ্রমিক বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদান করে। দোকান, হোটেল, কল-কারখানা প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় শতকরা ২৪ ভাগ বা ৫০ ভাগ গৃহস্থালীর কাজে নিযুক্ত।

পশ্চিমবঙ্গে শিশুশ্রমিকের প্রায় অর্ধেক কেবল খাদ্যের বিনিময়ে শ্রমদান করে। বলপূর্বক অসামাজিক কাজে এদের লিপ্ত করানো হয়। এছাড়াও এদের চুরি, ছিনতাই, ভিক্ষাবৃত্তি প্রভৃতি কাজে লাগিয়ে এক শ্রেণীর সমাজবিরোধী প্রচুর অর্থ উপার্জন করে, এবং এই উদ্দেশ্যে প্রচুর সংখ্যক শিশু অপহরণ করা হয়। অহরহ এই অসহায় শিশুরা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে।

এখনও আমাদের দেশে দারিদ্র্যসীমার নীচে

বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৭০ শতাংশ। সুতরাং আর্থিক প্রতিবন্ধকতার জন্য আমরা নিজেরাই নিজ সন্তানদের শিশু শ্রমিকের বৃত্তি নিতে বাধ্য করি। এছাড়া দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে উদ্বাস্তুজীবনের ছিন্নমূলতা, উচ্ছৃঙ্খল পিতা-মাতার নৃশংস আচরণ এবং আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো নড়বড়ে হওয়ায় আজ; এই সভ্য সমাজই শিশু শ্রমিক প্রথা সমস্যাটির জন্য অনেকাংশে দায়ী।

১৯৮৬ সালের ৫ নভেম্বর, রাজ্যসভায় 'শিশু শ্রমিক বিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ' এই আইনটি স্বীকৃতি লাভ করলেও তা ছিল শুধু কাগজে কলমে। প্রকৃতপক্ষে আইনগুলির সদ্ব্যবহার করা সম্ভব নয়। যেখানে অসংগঠিত ও সংগঠিত শিল্পে শিশুশ্রমিক বৃত্তি নিয়োগ করা আইনত নিষিদ্ধ, অথচ সেখানে আছে অজস্র আইনের ফাঁক। দেশের আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে শিশুদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। আসলে আইন দিয়ে সমস্যার বাস্তব সমাধান সম্ভব নয়। চাই উপযুক্ত শিক্ষার প্রসার এবং সামাজিক সচেতনতা।

ব্যাপকভাবে উপযুক্ত শিক্ষার প্রসার না ঘটলে কিছুই সম্ভব নয় এবং এর সঙ্গে কমাতে হবে জন্ম হারকেও। তা না হলে যে কোনো প্রকার সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব নয়। এই সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সচেতন হতে গ্রাম ও শহরের উচ্চ ও নিম্ন সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। শিশুদের অধিকারের সরকারিবিধিগুলিকে কার্যকর করতে আমাদেরই সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। সমাজের অবহেলিত, বঞ্চিত শিশুদের বাস্তব জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ দ্বারা আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ হিসেবে ঘোষিত শিশুবর্ষে সার্বিকভাবে শিশুদের এই বাস্তব পরিস্থিতির মূল্যায়ন করার সময় এসেছে। রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে সর্বভারতীয় স্তরেও উপযুক্ত শিক্ষার প্রসার ও প্রচারে আমাদেরই অগ্রণী হতে হবে। বর্তমানে দেশের সভ্যসমাজের মানুষ যেখানে বিবেকশক্তি ও স্বাধীনতালাভের বড়াই করে, সেখানে কেন থাকবে মানবাত্মার অপমান ও নির্লজ্জতার উদাহরণ? □

প্রাণ ধারণের জন্য অক্সিজেনের পরেই জলের প্রয়োজন

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

খাবার না খেলে বেশ কিছুদিন বেঁচে থাকা যায়, কিন্তু কয়েকদিন জল খেতে না পারলে মৃত্যু অবধারিত। জলাভাবে দেহের ওজন ১০-২০ শতাংশ কমে গেলে যে-কোনও প্রাণী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মানুষের দেহের ওজনের প্রায় ২/৩ অংশই

জল। বয়স্ক ব্যক্তির তুলনায় শিশুদের দেহে এবং প্রাপ্তবয়স্কা মহিলাদের তুলনায় প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের দেহে জলের পরিমাণ বেশি। একজন অ্যাথলিটের দেহে জলের পরিমাণ বেশি।

● জল কলাকোষ গঠনের জন্য অপরিহার্য উপাদান।

● জল দেহের অন্তর্দেশীয় তরল পরিবেশের সাম্যাবস্থা বজায় রাখে এবং এই সাম্যাবস্থার ওপর প্রাণীকোষের সজীবতা ও সক্রিয়তা নির্ভর করে। দেহকোষের ভেতরে ও বাইরে এবং বিভিন্ন দেহকলায় জলের বণ্টন ও পরিমাণ প্রধানত ওইসব স্থানের জলে দ্রবীভূত নানা বস্তুর অভিস্রবণ চাপের ওপর নির্ভর করে। জল একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দ্রাবক এবং এর দ্রবীকরণ ক্ষমতা অন্তঃকোষীয় ও বহিঃকোষীয় রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়াগুলি সম্পাদনে সহায়তা করে।

● পৌষ্টিকতন্ত্র থেকে ক্ষরিত বিভিন্ন পরিপাককারী রসের জলীয় অংশ খাদ্যকে নরম ও তরল করে পরিপাকের উপযোগী করে এবং আর্দ্রবিশ্লেষণের সহায়তায় খাদ্যকে পরিপাক ও বিপাকে সাহায্য করে।

● জলীয় মাধ্যমের সাহায্যে প্রাণীদেহের কোষগুলি প্রয়োজনীয় পুষ্টি লাভ করে এবং দূষিত বর্জ্যপদার্থ জলের মাধ্যমে রেচন অঙ্গে পৌঁছায়।

● জল আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে ঘর্ষণ ও শুষ্কতা প্রতিরোধ করে। ফলে, বিভিন্ন অঙ্গ ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়।

● এছাড়া জল আমাদের দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ত্বক ও ফুসফুসের মাধ্যমে জলের বাষ্পীভবন দেহ তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

জলের মাধ্যমে আমরা শরীরের জন্য তরকারি কিছু খনিজ লবণ যেমন ফ্লোরাইড, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, জিঙ্ক, তামা ইত্যাদি পেয়ে থাকি। আবার কিছু বিষাক্ত দ্রব্য যেমন সিসা, ক্যাডবিয়ান, আর্সেনিক, পেস্টিসাইড জলের মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে শারীরিক নানা ক্ষতি করে। সেজন্য এই সব বিষাক্ত পদার্থ মুক্ত পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ করা জনস্বাস্থ্য বিভাগের অবশ্য কর্তব্য।

বিভিন্ন উপাদান সংবলিত দেহমধ্যস্থ জলীয় তরলকে দেহতরল বলা হয়। দেহের মধ্যে দুটি প্রধান স্থানে একটি বিস্তৃত থাকে—(১) কোষের মধ্যে এবং (২) কোষের বহির্দেশে (যার মধ্যে কোষ ডুবে থাকে)। কোষঝিল্লির দ্বারা পৃথকীকৃত, কোষমধ্যস্থ তরল অন্তঃকোষীয় তরল এবং কোষ বহির্ভূত তরল বহিঃকোষীয় তরল নামে পরিচিত। বহিঃকোষীয় তরল, প্লাজমা, কলারস, লসিকা, কোষান্তরীয় জল, তরুণাস্থি ও ঘনসংযোগ রক্ষাকারী কলা নিহিত জল এবং অলভ্য অস্থি নিহিত জলের সমন্বয়ে গঠিত।

দেহের বিভিন্ন রসে দ্রবীভূত সোডিয়াম, পটাশিয়াম ক্লোরাইড প্রভৃতি অজৈব আয়ন এবং প্রোটিন ও অন্যান্য জৈব যৌগের অভিস্রবণ চাপ দেহের কোষ বহির্ভূত ও কোষাভ্যন্তরীণ রসে জলের সঠিক বণ্টন বজায় রাখে। শরীরে জলের অভাব হলে কোষ বহির্ভূত রস গাঢ় হয়, ফলে কোষের ভিতর থেকে জল বাইরে চলে আসায় কোষগুলি জলহীন বা শুষ্ক (ডিহাইড্রেটেড) হয়। উদরাময়, অত্যধিক বমি ও ঘাম, গ্রীষ্মকালে যথেষ্ট জল পান না করা, উচ্চ তাপসম্পন্ন কারখানার চুল্লিতে কাজ করা জলহীনতা সৃষ্টি করতে পারে। ফলে রক্তসংবহনের ব্যাঘাত ঘটে। রক্তচাপও কমে যায়, পেশিকোষের দুর্বলতা দেখা যায়। খাবার ইচ্ছে কমে যাওয়া, অবসাদগ্রস্ততা বৃদ্ধি পায়।

দৈনিক জলের চাহিদা নির্ভর করে ব্যক্তির জীবনযাত্রার পদ্ধতির ওপর। সাধারণত এর পরিমাণ হয় ৫০৮০ মিলিলিটার/কেজি দৈহিক ওজনের ওপর। ব্যায়াম, উচ্চতাপ, কম আর্দ্রতা, সমুদ্রতলের ওপর উচ্চতা এবং উচ্চ চর্বিযুক্ত খাদ্য শরীরে জলের চাহিদা বাড়িয়ে দেয়। কোনও কারণে অতিরিক্ত জল দেহমধ্যে যদি প্রবেশ করে তাহলে কোষবহির্ভূত রস লঘুতর হয়ে যায় এবং কোষের মধ্যে বেশি জল ঢুকে পড়ে। এর ফলে জলাধিক্যের উপসর্গ দেখা যায়। তার কারণে কোষগত তড়িৎ-বিশ্লেষণের তীব্রতার হ্রাস এবং বিপাকক্রিয়ার বিপর্যয় ঘটে।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে সুস্থ থাকার জন্য যখনই তেষ্টা পাবে, শরীরে জলসাম্য বজায় রাখার জন্য খান পরিশ্রুত সাদা জল (সম্ভব হলে এতে দিন এক চিমটি নুন ও এক চামচ চিনি), গরম চা, ডাবের জল, বাড়িতে তৈরি ঘোলের সরবত, তরমুজের শরবত, ফলের রস, সুপ, ডালের জল, ঝালমশলা কম দেওয়া সবজি ও মাছের ঝোল। শশাও আমাদের জলের পিপাসা মেটাতে সাহায্য করে। মনে রাখবেন, রাস্তার বরফ দেওয়া রঙিন জলের সরবত, লেবুর জল একেবারেই খাওয়া চলবে না। □

স্মৃতিতে মহিষাসুরমর্দিনী

নন্দলাল ভট্টাচার্য

এক কথায় অবাক কাণ্ড। অথবা বলা যায়, বিস্ময়ের ধর্মই এই। সব সময় চেনা বা বাঁধা সড়ক ধরে পা ফেলে না তা। নাহলে কেউ কি আগে ভেবেছিল এমনটা, তাই-বা কেন, শুরুর মুহূর্তে তার সৃজনকারদের মস্তিষ্কেও কি খেলেছিল এমন সম্ভাবনার বিজলি-ঝলক। অবিশ্বাস কি তাঁদেরও মনে ছিল না। ছিল না কোনো আশঙ্কা?

হয়তো ছিল। হয়তো নয়। আসলে কোনো সৃষ্টিকর্মেই তো এমন হিসেব করে হাত দেওয়া যায় না। তাঁরাও তা ভাবেননি। অথচ প্রায় ক্ষণিক-চিন্তার ফসল— একটি বিনোদন অনুষ্ঠান আজ হয়ে উঠেছে পূজার আগমনি। শতবর্ষ থেকে প্রায় এক দশক দূরে দাঁড়ানো একটি অনুষ্ঠান আজও একই ভাবে বাঙ্গালির মননের দুয়ারে কড়া নাড়ে। উসকে দেয় স্মৃতিকে। এক ধরনের মেদুরতায় আচ্ছন্ন করে অন্তরকে।

হ্যাঁ, পিতৃতর্পণ শুরুর আগে ব্রাহ্মমুহূর্তে আকাশবাণী থেকে ইথার তরঙ্গে ভেসে আসা মহিষাসুরমর্দিনীর কথাতেই ভিড় করে এমন অসংখ্য প্রশ্ন, বিস্ময় অথবা গৌরচন্দ্রিকার ভণিতা।

আজও মহালয়ার ভোরে কিছুটা অবচেতন ভাবেই খুলে যায় মনের জানলা। অসংখ্যবার শোনার পরও কানে মন্দ্রিত হয় কিছু কথা-গান-স্তোত্রের সুর। আকাশবাণী নয়, সাবেক অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে 'মহিষাসুরমর্দিনী'র সম্প্রচার শুরুর বছর সম্পর্কে কিছু মতান্তর আছে। কেউ বলেন ১৯৩১, কারও মতে ১৯৩২-এ প্রথম সম্প্রচারিত হয় একবারে সরাসরি এই অনুষ্ঠান। আগে থেকে রেকর্ড করা নয়, একবারে হাতে গরম পাঁপড় ভাজার মতোই 'সদ্য' বলা কথা-গান-স্তোত্র 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবিষ্ট হতো তখন।

এতো, অনুষ্ঠানের ইতিহাসের একটু ছবি, কিন্তু কবে প্রথম শুনি এই অনুষ্ঠান? স্মরণের চোরা গলিতে পাক সরতেই ভেসে আসে সেই সময়টার কথা।

আমি রেডিয়োতে মহালয়ার এই অনুষ্ঠান শুনি সম্ভবত ১৯৫২- ৫৩ খ্রিস্টাব্দে। নেহাতই বালক বয়স সেটা। তাই ওই অনুষ্ঠান শোনার অনুভূতিটা অনেক হাতড়েও আজ ঠিক ঠাহর করতে পারি না। তখন খুব অল্প বাড়িতেই ছিল রেডিয়ো। ফলে যন্ত্রটার কথা জানা থাকলেও তা শোনার সুযোগ ছিল কম।

ঘটনাচক্রে কিছুটা অভাবিত ভাবেই আমাদের বাড়িতে রেডিয়ো আসে ওই বাহান্ন-তিপান্ন সালে। তাতে অনুরোধের আসর বা শুক্রবারের নাটক শোনার স্মৃতি এখনও কিছুটা সজীব। আর মহালয়া শোনার ব্যাপারটা তো ছিল অনেকটা উৎসবের মতোই।

বয়স অনেকটা বাড়ার পরের স্মৃতিটা অবশ্য অনেকটাই টাটকা। অনুষ্ঠান চলার মধ্যেই চা আর অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার প্রায় পরে পরেই ময়রার দোকান থেকে সিঙাড়া-জিলিপি খাওয়ার স্বাদটা এখনও যেন জিবের ডগায়।

যাক সে কথা। বরং বলি, এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে তখন বাড়িতে ছিল একটু আপত্তির হাওয়া। সেটা অন্য কোনো কারণে নয়, কায়স্থের কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ শোনা এবং বেশ কিছু উচ্চারণ বিকৃতির জন্য। পরে অবশ্য অবস্থার বদল ঘটে। সমালোচনার রেশও তখন অনেকটাই কেটে গেছে। তবে বিরূপ আলোচনা যে একবারে হতো না তা নয়। এর অবশ্য কিছু কারণ রয়েছে। আর সেটা যে শুধু আমাদের পরিবারে ছিল তা নয়, সেটা এই অনুষ্ঠান শুরুর সময় বেতার কর্তৃপক্ষকেও রীতিমতো ভাবিয়ে তুলেছিল। শ্রোতাদের মধ্যেও একটা অংশ সরাসরি তাঁদের আপত্তির কথা জনিয়েছিলেন। বিরোধিতাটা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছয় যে অনুষ্ঠানের ভবিষ্যৎ নিয়েই প্রশ্ন দেখা দেয়। আপত্তি ছিল মূলত দুটি।

প্রথমত, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র অ-ব্রাহ্মণ। তিনি কেন চণ্ডীপাঠ করবেন। তাছাড়া তাঁর কিছু শব্দ উচ্চারণ নিয়ে উঠেছিল বেশ জোরালো সমালোচনা। দ্বিতীয় আপত্তি, অনুষ্ঠান সম্প্রচারের দিন ও সময় নিয়ে। প্রশ্ন উঠেছিল পিতৃপক্ষ শেষ বা তর্পণের আগেই চণ্ডীপাঠ ও দেবীবন্দনা নিয়ে। আর এই দুটি আপত্তির বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এই অনুষ্ঠানের মূল পরিকল্পক এবং রচনাকার বাণীকুমার। এই অনুষ্ঠানটির প্রথম সম্প্রচারের সময় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র গ্রন্থনা বা কাহিনি অংশ পাঠ করলেও চণ্ডীর স্তোত্র শোনা গিয়েছিল বাণীকুমারের কণ্ঠে। অবশ্য তখন অনুষ্ঠানটির নাম ছিল অন্য। বাণীকুমার কিন্তু প্রথম প্রচারের পথেই রায় দেন, চণ্ডীপাঠ থেকে গ্রন্থনা— সবই করবেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। আর সেটা না হলে অনুষ্ঠানই বন্ধ করে দেওয়ার কথা বলেন তিনি। বেতার কেন্দ্রের ভারতীয় অনুষ্ঠানের অধিকর্তা নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারও সমর্থন করেন বাণীকুমারকেই। ফলে বহাল রইলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রই।

মহালয়ার ভোরে অনুষ্ঠানটির সম্প্রচার নিয়ে জোরালো সওয়াল করলেন নৃপেন্দ্রনাথ। বাণীকুমার ও আরও কিছু বিশিষ্টজনের সমর্থনে তিনি বললেন, মহালয়ার ভোরের এই সম্প্রচার কোনো পুজা-অর্চনা নয়, এটি নিছকই একটি বিনোদন অনুষ্ঠান। একটি বিনোদন অনুষ্ঠান তো আর পাঁজিপুঁথি দেখে হয় না। সেটি যে কোনো সময়ই হতে পারে। তার মূল্যায়ন হবে সামগ্রিক অনুষ্ঠানের গুণগত মান এবং শ্রোতাদের ভালোবাসার ওপর। শ্রোতারা যদি শুনতে চান তাহলে তা সম্প্রচারিত হবে। এক্ষেত্রে অন্য আপত্তি তাঁরা মানবেন না।

প্রথা ভাঙার অনেক কিছুই ছিল ওই অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানটি প্রকৃতপক্ষে ত্রয়ী— অর্থাৎ বাণীকুমার, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও পঙ্কজকুমার মল্লিকের সৃষ্টি। মহিষাসুরমর্দিনীকে বলা যায় বাণীকুমারের মানসসন্তান। তিনিই এর রচনাকার-গীতিকার। গোটা বিষয়টির মূল পরিকল্পক ও তথ্য সংগ্রাহক।

বাণীকুমার প্রেসিডেন্সি থেকে ইংরেজি নিয়ে বিএ পাশ করলেও তাঁর বাবা ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ। বাড়ির আবহাওয়ার সঙ্গে মিশে ছিল সংস্কৃত শাস্ত্র চর্চার ঘনিষ্ঠ প্রয়াস। সে কারণেই বাণীকুমার, যাঁর প্রকৃত নাম বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, শিখেছিলেন সংস্কৃত। উপাধিও পেয়েছিলেন তিনি। ফলে চণ্ডী এবং অন্যান্য পুরাণ ইত্যাদি সম্পর্কে ছিল তাঁর অনায়াস দখল। তাছাড়া প্রেসিডেন্সি কলেজেই বন্ধুত্ব হয় তাঁর তখনকার বিশিষ্ট পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে। পরবর্তীকালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ গৌরীনাথ শাস্ত্রীর দাদা তিনি। সেই অশোক শাস্ত্রীর কাছ থেকে তিনি এটি রচনার সময় নেন নানা পরামর্শ। শোনা যায়, বাগবাজারে অশোক শাস্ত্রীর বাড়িতে বাণীকুমার তাঁর রচনার এক একটি অংশ শোনাতেন। আর অশোক শাস্ত্রী প্রয়োজন মতো তা সংশোধন করতেন বা পরামর্শ নিতেন। আর তারই ফলে এই রচনার পৌরাণিক বা শাস্ত্রগত তথ্যে কোনো খামতি ছিল না।

এবার পঙ্কজকুমারের কথা। সুরসংযোজনার ক্ষেত্রে তিনিও একরকম দুঃসাহসের পরিচয় দেন। অনুষ্ঠানটি ভোরে প্রচারিত হয়। স্বাভাবিক ভাবেই ভৈরবী বা ভৈঁরো রাগের প্রাধান্য থাকার কথা। কিন্তু সূচনাতেই পঙ্কজকুমার ব্যবহার করলেন রাতের রাগ মালকোষ। এবং তাতেই বাজিমাত। রক্ষণশীলরা যাই বলুন, সমগ্র অনুষ্ঠানটি মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে এই মালকোষ, ভৈরবী, বিভাস ইত্যাদি রাগরাগিণীর ব্যবহারে।

অনুষ্ঠানটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য— এর যন্ত্রশিল্পীদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন মুসলমান। তাঁদেরও কিন্তু এমন একটি ধর্মভিত্তিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কোনো অসুবিধে হয়নি। যদিও কিছু গোঁড়া মুসলমান এধরনের অনুষ্ঠানে যোগ না দেওয়ার জন্য তাঁদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। কিন্তু শিল্পী হিসেবে তাঁরা সে চাপ অগ্রাহ্য করে এক বিশেষ নজির গড়েন।

মহিষাসুরমর্দিনী প্রথম থেকেই মহালয়ার ভোরে সম্প্রচারিত হয়নি। এমনকী এটাই রচনাটির আদি নামও নয়। ঐতিহাসিক তথ্যে সন-তারিখ নিয়ে কিছু মতভেদ থাকলেও মোদ্দা কথা, ১৯৩২ অর্থাৎ ১৩৩৮ সনের চৈত্র মাসে অন্নপূর্ণা পূজা আর বাসন্তী পূজার মধ্যে ছিল একটা সময়ের ব্যবধান। সেটা অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো গড়ে ওঠার কাল। ডালহৌসি বা আজকের গার্স্টিন প্লেসে তখন রেডিয়োর অফিস এবং সম্প্রচার কেন্দ্র। এক বিকেলে বাণীকুমার, রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজ কুমার মল্লিক, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং ভারতীয় অনুষ্ঠানকর্তা নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারের মজলিশে বাণীকুমারই বাসন্তীপুজো নিয়ে একটি গীতি আলেখ্য সম্প্রচারের প্রস্তাব দেন। হইহই করে সায় দেন সকলে। আলেখ্যটি রচনার দায় বর্তায় বাণীকুমারের ওপর। তিনি লিখে গেলেন 'বসন্তেশ্বরী'। গানে ছিলেন পঙ্কজ কুমার মল্লিক, রাইচাঁদ বড়াল ও হরিশচন্দ্র বালি। গ্রন্থনা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ আর স্তোত্রপাঠে বাণীকুমার স্বয়ং। সম্প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রোতাদের মধ্যে দারুণ আলোড়ন। আবারও শুনতে চান তাঁরা। সেই দাবি মেনেই ইংরেজির সেই বছরে বা বাংলা ১৩৩৯ সনের ষষ্ঠীর দিন প্রচারিত হয় অনুষ্ঠানটি। অবশ্য নাম বদলে। 'বসন্তেশ্বরী' হয় 'শারদবন্দনা' বা 'মহিষাসুর বধ'। ১৯৩৭ বা ১৩৪৪ সনে এর নবনামকরণ 'মহিষাসুরমর্দিনী' এবং সেই নামেই গড়ে ওঠে ইতিহাস। অবশ্য ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হতো মহাষষ্ঠীর ভোরে। তার পরের বছর থেকে মহলায়ার ভোরে পাকা জায়গা করে নেয় এটি।

এই একই বছরের ইতিহাসে রাজনৈতিক কারণেই ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৩ সেপ্টেম্বর সম্প্রচারিত হয় মহিষাসুরমর্দিনীর পরিবর্তে 'দেবী দুর্গতিহারিণী' নামে একটি নতুন অনুষ্ঠান। পুরনো সকলকে বাদ দিয়ে উত্তমকুমারকে দিয়ে গ্রন্থনা, হেমন্তকুমার, লতা মঙ্গেশকরের মতো তারকাশিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হয়। মনে আছে, সেদিন অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে ওঠে ধিক্কার। সেই সকালেই আকাশবাণীর বর্তমান ভবনের সামনে চলে বিক্ষোভ। জনরোষে বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ ষষ্ঠীর দিন আবার সম্প্রচার করেন 'মহিষাসুরমর্দিনী'। এবং তারপর থেকে মহালয়ার ভোরে এটাই হয়ে উঠেছে বাঙ্গালির শারদ উৎসবের যেন প্রকৃত আগমনী। আগে অনুষ্ঠানটি সরাসরি স্টুডিয়ো থেকে প্রচারিত হলেও এখন শোনা যায় তার রেকর্ডবদ্ধ রূপ।

প্রসঙ্গত, মহালয়ার এই 'মহিষাসুরমর্দিনী' শোনার স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি ব্যক্তিগত ঘটনা। আমার বাবা রামরতন সাংখ্যশাস্ত্রীর শিক্ষাদীক্ষা ছিল কাশীতে। কথকতা ছিল তাঁর জীবনের প্রাথমিক পেশা। আকাশবাণী থেকে নিয়মিত সম্প্রচারিত হতো তাঁর কথকতা। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি অসুস্থ হওয়ার সময় পর্যন্ত হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর কথকতার একটি রেকর্ডও।

তারকেশ্বরে পাঁচের দশকের প্রথমে তিনি হন মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। কিন্তু তাতে কথকতায় ক্ষান্তি পড়েনি কখনও। সম্ভবত ছয়ের দশকের একবারে শুরুতে তিনি চণ্ডীর ওপর একটি আলেখ্য লিখে স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে মহালয়ার ভোরে মাইকে প্রচার করেন ভোর তিনটের সময়। মন্দির সংলগ্ন সুউচ্চ নবহতখানা থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠানটির আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায় বহু তারকেশ্বরবাসীর। তাঁরা ভাবেন তাহলে মহালয়ার অনুষ্ঠানটির কি সময় বদল হয়েছে অথবা তাঁদেরই ঘুম ভেঙেছে দেরিতে? তাড়াতাড়ি রেডিয়ো চালাবার পর ভুল ভাঙে তাঁদের চারটের আগে শেষ হওয়া ওই অনুষ্ঠানের ঘোষণা। নেহাতই ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু স্মৃতি তো, তাই উল্লেখের লোভ সামলাতে পারলাম না। আশা করি, কেউ ভুল বুঝবেন না। ■

রেডিয়োয় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ মানে উমা আসছে

নিখিল চিত্রকর

মহালয়ার ভোর। বাঙ্গালির শশব্যস্ত জীবনে বছরের এই একটা দিনের শুরু হয় একটু অন্যরকম ভাবে। ওইদিন ভোরে আধো ঘুমের আবেশে মনের ভিতর বেজে ওঠে শরতের আলোর বেণু। ঘরের কর্নার টেবিল থেকে বেরিয়ে আসে অ্যান্টিক শো-পিস হিসেবে সাজিয়ে রাখা সাবেক রেডিয়ো। হালফিলের ব্লুটুথ স্পিকার, পেনড্রাইভ থেকে ইউটিউব সর্বত্রই স্বমহিমায় বিরাজমান 'বিরূপাক্ষ'— বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

মহালয়ায় পিতৃপক্ষের অবসান। আবার এদিনেই দেবীপক্ষের শুরু। কৈলাশে তখন ব্যস্ত উমা। চলছে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়ি আসার তোড়জোড়। মর্ত্যবাসীর বাড়ির মেয়ে উমাকে বরণ করতে আগামী সাতদিন হইহই, রইরই কাণ্ড। অস্থির থিম পুজোর ভিড়, পাড়ার পাড়ায় প্যান্ডেল, আর গ্রামে-গঞ্জে বারোয়ারি পুজোর সাড়ম্বর আয়োজন। বাঙ্গালির তেরো পার্বণের মধ্যে দুর্গাপুজো যে মহোৎসবের মহিমা অর্জন করেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শরতের মেঘ, শিশিরের শীতল স্পর্শ আর কাশফুলের বরণডালা সাজিয়ে মহালয়ার দিন থেকেই বাঙ্গালি কোমর বাঁধে দেবী বরণের।

দেবীপক্ষের আগমনী সকালের আরেক বিশেষত্ব হলো তর্পণ। পিতৃপুরুষদের আত্মার শান্তি কামনায় পুজো উপাচারের মাধ্যমে অবগাহন করে অঞ্জলি প্রদান করা হয় তর্পণের মধ্য দিয়ে। শাস্ত্র অনুসারে দেবীদুর্গার মূল পুজোটি অনুষ্ঠিত হয় বসন্তকালে। যা বাসন্তীদেবীর পুজো নামে প্রচলিত। তবে ত্রেতাযুগে ভগবান বিষ্ণুর সপ্তম অবতার শ্রীরামচন্দ্র মাতা সীতাকে উদ্ধারের জন্য লঙ্কা বিজয়ের উদ্দেশে দেবী দুর্গার পুজো করেছিলেন। সময়টা ছিল শরৎকাল। অসময়ে শ্রীরামচন্দ্রের এই দুর্গাপুজো, তাই অকালবোধন নামেই পরিচিত। সনাতন ধর্মের রীতি অনুযায়ী কোনও শুভকাজ করতে গেলে পূর্বপুরুষ এবং সমগ্র জীবজগতের জন্য তর্পণ করা বিধেয়। শ্রীরামচন্দ্রও শারদীয় দুর্গাপুজোর প্রারম্ভে সনাতন রীতি অনুসরণ করে তর্পণ করেছিলেন মহালয়ার অমাবস্যা তিথিতে। ভূ-ভারতে চিরস্রোতস্বিনী গঙ্গার মতোই মহালয়ায় তর্পণের রেওয়াজ আজও প্রবহমান।

পুরাণ অনুযায়ী, মর্ত্যে জীবিত ব্যক্তির আগের তিন পুরুষ পর্যন্ত পিতৃলোকের অবস্থান। মৃত্যুর দেবতা যম হলেন এই পিতৃলোকের অধিপতি। তিনিই সদ্যোমৃত ব্যক্তির আত্মাকে মর্ত্যলোকে থেকে পিতৃলোকে নিয়ে যান। প্রচলিত বিশ্বাস, পরবর্তী প্রজন্মের একজনের মৃত্যু হলে পূর্ববর্তী প্রজন্মের একজন পিতৃলোক ছেড়ে স্বর্গের উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং পরমাত্মায় লীন হন। স্বর্গলোক প্রাপ্তির পর আত্মার আর কোনও শ্রাদ্ধাচারের প্রয়োজন হয় না।

সূর্য কন্যারাশিতে প্রবেশ করলে সুচনা হয়

আকাশবাণীর ‘মহিষাসুরমর্দিনীর কিংবদন্তী

● ১৯৩২ সাল থেকে আজও প্রতি বছর মহালয়ার দিন রেডিয়োয় আকাশবাণীতে সম্প্রচারিত হয়ে আসছে ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ অনুষ্ঠানটি।

● ৯০ বছর পরেও এই অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা একটুও কমেনি।

● দেড় ঘণ্টার এই বেতার অনুষ্ঠানের ভাষ্যপাঠে কণ্ঠ দেন বেতার শিল্পী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। তাঁর কণ্ঠস্বরটি অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর ইতিহাসে ‘সিগনেচার টোন’-এ পরিণত হয়েছে।

● ১৯৩২ সালের চৈত্র মাসে বাসন্তী ও অন্নপূর্ণা পূজার সন্ধিক্ষণে প্রথম সম্প্রচারিত হয় বসন্তেশ্বরী অনুষ্ঠান।

● বসন্তেশ্বরীর স্ক্রিপ্ট লিখেছিলেন বাণীকুমার। মার্কণ্ডেয় পুরাণের শ্রীশ্রীদুর্গা সপ্তশতী বা শ্রীশ্রী চণ্ডী থেকে নেওয়া স্তোত্র, বাংলা ভক্তিগীতি, ধ্রুপদ সংগীত এবং পৌরাণিক কাহিনির অবলম্বনে রচিত হয়েছিল এই বিশেষ বেতার অনুষ্ঠানটি।

● সেই বছরই দুর্গাপুজোয় মহাষষ্ঠীর দিন ভোরে ‘বসন্তেশ্বরী’ অনুষ্ঠানের কিছু অংশ পরিমার্জন করে সম্প্রচারিত হয়। সংগীত পরিচালনা করেছিলেন রাইচাঁদ বড়াল, চণ্ডীপাঠ করেন বাণীকুমার নিজে এবং নাট্যকথা সূত্রের ভূমিকায় ছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

● ১৯৩১-৩৬ পর্যন্ত প্রতিবছরই অনুষ্ঠানটির কিছু পরিবর্তন করে সম্প্রচারিত হতে থাকে। এই সময় পর্যন্ত অনুষ্ঠানটি ‘মহিষাসুর বধ, শারদ বন্দনা’ নামে সম্প্রচারিত হতো।

● ১৯৩৭ সালে এই অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হয় ‘মহিষাসুরমর্দিনী’। সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে আসেন পঙ্কজকুমার মল্লিক। ভাষ্যপাঠ ও গ্রন্থনা করেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। সেই থেকে আজ পর্যন্ত ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ নামেই মহালয়ার ভোরে একটানা অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হয়ে আসছে।

● ১৯৬৬ পর্যন্ত ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ লাইভ সম্প্রচার হতো কলকাতার আকাশবাণী থেকে। তারপর থেকে আর লাইভ রেকর্ডিং করা হয়নি। এখন মহালয়ার ভোরে ’৬৬ সালে রেকর্ড করা অনুষ্ঠানটিই সম্প্রচার করা হয়।

পিতৃপক্ষের। লোকবিশ্বাস, এই সময় পূর্বপুরুষেরা পিতৃলোক পরিত্যাগ করে মর্ত্যে তাঁদের ছেড়ে যাওয়া বাড়িতে পুনরায় ফিরে আসেন। এবং দেবীপক্ষের আগে পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের হাতে পরাজিত ও নিহত হন কর্ণ। পুণ্যফলে তিনি স্বর্গলাভ করলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে ঘটল বিপত্তি। খাদ্য বা পানীয়ের পরিবর্তে শুধুই সোনা-রুপো-হীরে-জহরত বরাদ্দ হলো তাঁর জন্য। মহাবীর কর্ণ এর কারণ জানতে চাইলে বলা হলো, আজীবন শক্তির উপাসনা করে এসেছেন কর্ণ। কখনও নিজের পূর্বপুরুষদের কথা তিনি স্মরণ করেননি। পূর্বপুরুষদের আত্মার উদ্দেশে শ্রাদ্ধশান্তিমূলক অঞ্জলিও দেননি। তর্পণাদিও করেননি। তাই কর্মফলে তিনি স্বর্গে আসার ছাড়পত্র পেলেও খাদ্য পানীয় পাবার যোগ্য নন। উত্তরে আত্মপক্ষ সমর্থন করে কর্ণ জানান, আশৈশব নিজের বংশপরিচয় তিনি জানতেন না। জন্ম মুহূর্তেই জন্মদাত্রী মা তাঁকে ত্যাগ করেন। সূত বংশের অধিরথ ও স্ত্রী তাঁকে পালন করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর মাত্র ১৬-১৭ দিন আগে তিনি তাঁর বংশ পরিচয় জানতে পারেন। কাজেই সেই সময়ে পূর্বপুরুষদের তর্পণ বা শ্রদ্ধানুষ্ঠান করার পরিস্থিতি তার ছিল না। তখন স্বর্গলোকের নিদানে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ প্রতিপদ তিথিতে কর্ণ আবার মর্ত্যে ফিরে আসেন। এক পক্ষকাল থেকে পিতৃপুরুষদের তিল-জল দান করে আশ্বিনের অমাবস্যা তিথিতে তর্পণাদি করে স্বর্গে ফিরে যান। এই বিশেষ সময়টাকেই শাস্ত্রে পিতৃপক্ষ বলা হয়েছে। কর্ণের মর্ত্যে আগমনের এই ঘটনার জন্যই হয়তো অনেকে বলেন, পিতৃপক্ষের পনেরো দিন পিতৃপুরুষরা মনুষ্যলোকের কাছাকাছি চলে আসে। পুরাণ মতে ব্রহ্মার নির্দেশেই গড়ে ওঠে এই মহামিলন ক্ষেত্রটি। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে অবশ্য পালনীয় যে পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিধান কথাটির অর্থ হলো, যাতে অন্যেরা তৃপ্তিলাভ করে সেই উদ্দেশে জলদান। তাই শুধু যে পিতৃপুরুষের উদ্দেশেই জল দান, তেমনটা নয়। সর্বভূতের উদ্দেশেই করতে হয়।

তর্পণের মন্ত্রের মধ্যেই রয়েছে সর্বভূতে জলদানের নির্দেশ :

‘আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তং দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্বে মাতৃমাতামহোদয়ঃ।।
আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু।

অর্থাৎ দেবগণ, ঋষিগণ ও নরগণ— ব্রহ্মা থেকে তৃণশিখা পর্যন্ত

সমস্ত জগৎ আমার প্রদত্ত অন্নজলে তৃপ্তিলাভ করুন। এই হলো তর্পণের গূঢ় কথা। কথায় বলে, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম অর্থাৎ সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়। তাই জলদান করতে হয় সর্বভূতের উদ্দেশেই।

বঙ্গজীবনের নানা পার্বণ উদ্‌যাপনের তালিকায় মহালয়াও পাকাপোক্ত ভাবে ঠাঁই নিয়েছে। ইদানীং স্মার্ট ফোনের রমরমায় হোয়াটসঅ্যাপ ইনস্টাগ্রাম বা ফেসবুকের মতো সমাজ মাধ্যমে শুভ মহালয়ার শুভেচ্ছার ঢল নামে। পণ্ডিতেরা বলেন, মহালয়া শুভ নয়। কেননা পিতৃপক্ষের অবসানের এই দিনে মৃতের আত্মার উদ্দেশে জল দান করার বিধিবদ্ধ রীতি পালন করা হয়। এটি শোকের দিন। কাজেই এটি কোনও শুভ দিনের মধ্যে পড়ে না। আগেই আলোচনা করলাম তর্পণ অনুষ্ঠানটি হলো হিন্দুদের অবশ্য পালনীয় নিত্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের অন্যতম। কাছেই এই অনুষ্ঠানকে অশুভ বলা যায় কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। বৃহত্তর অর্থে মহালয়ার দিনটিতে পিতৃলোক ও মর্ত্যলোকের জগৎব্যাপী মহামিলনের মহাক্ষেত্র তৈরি হয়। মিলনের এই মুহূর্ত ও তার উদযাপন শুভ না অশুভ তা পণ্ডিতেরাই ঠিক করবেন।

মহালয়ার ভোর আর আকাশবাণীতে সম্প্রচারিত 'মহিষাসুরমর্দিনী' এখন প্রায় সমার্থক। ষোলোকলায় পূর্ণ বঙ্গজীবনে বাঙ্গালি রীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের চণ্ডীপাঠকেও নিজস্ব ঘরানার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে আপন করে নিয়েছে। আশ্বিনের শারদ প্রাতে কাশফুলের দোল, ঢাকের বাদ্যি, শিউলিফুল ও লালপাড় শাড়ির সঙ্গে 'বাজলো তোমার আলোর বেণুও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। আমাদের ছেলেবেলায় ক্যাপ ফাটানো বন্দুকের সোঁদা গন্ধতেও যেন পুজোর মায়া জড়িয়ে থাকতো। মহালয়া মানেই আর মাত্র সাতদিন তার পরেই তো পুজোর বাদ্যি। দশভুজার বোধন। সঙ্গে তাঁর চার ছেলে-মেয়ে। মাথার উপর ভোলেবাবা। আর চালচিত্রে হরেক কিসিমের সাপ, পদ্ম, চক্র, ত্রিশূল আঁকা। আমাদের আটপৌরে জীবনে দুর্গাপূজা হলো ইচ্ছেপূরণ, মুশকিল আসান। তিনি দশহাতে রক্ষা করেন, আগলে রাখেন। মহালয়ার দিনটিতে মৃন্ময়ীমায়ের ত্রিনয়নে শিল্পীর ছোঁয়ায় চিন্ময়ী সত্তা জেগে ওঠে। মহালয়ার ভোর। অদ্ভুত মন কেমন করা। সব পেয়েছির দেশ আর নস্ট্যালজিয়া। গ্রাম থেকে বাবার হাত ধরে আসা ইজের পরা একটি ছেলের কাঁসর বাজানোর ছবি। মাথায় ছোটো লম্ফের শিখা জ্বেলে ব্যালেন্স রেখে পটুয়ার চোখ আঁকা। তাঁর আঁলোআধারি ওয়ার্কশপের টিনের চাল ছাড়িয়ে বহুদূর থেকে ভেসে আসে দ্বিজেন মুখুজ্যের কণ্ঠ.... জাগো দুর্গা... জাগো দশপ্রহরণধারিণী।

ফঃ ৪

৭৬-এ ছন্দপতন

১৯৭৬ সালে সরকারি চাপে 'আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ মহিষাসুরমর্দিনী'র পরিবর্তে ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তীর 'দেবীং দুর্গতিহারিণী' নামে অন্য একটি অনুষ্ঠান মহালয়ার দিন একই সময়ে সম্প্রচার করার সিদ্ধান্ত নেয়। অনুষ্ঠানটি ছিল তারকাখচিত। সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ভাষ্যপাঠ করেছিলেন উত্তমকুমার। মান্না দে, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁশলে, আরতি মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের মতো তারকা সংগীত শিল্পীরা এই অনুষ্ঠানে গান গেয়েছিলেন।

কিন্তু মহালয়ার দিন সম্প্রচারের কিছুক্ষণ পরেই ঘটে বিপর্যয়। শ্রোতারা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বরের বদলে উত্তরমকুমারের ভাষ্যপাঠ মেনে নিতে পারেননি। আকাশবাণী ভবনে টেলিফোন করে সেদিন শ্রোতারা উপর্যুপুরি অভিযোগ জানাতে থাকেন। এমনকী অনুষ্ঠান বন্ধ করতে বলেন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বর এবং মহিষাসুরমর্দিনীর বিপুল জনপ্রিয়তার কারণে সেদিন কলকাতার শ্রোতারা উত্তমকুমারের অনুষ্ঠানটি বয়কট করেছিল।

অনুষ্ঠান শেষ হতেই বিশাল জনতা আকাশবাণীর সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। পাড়ায় পাড়ায় মানুষ রেডিয়ো, ট্রানজিস্টার আছড়ে ফেলে প্রতিবাদ জানিয়েছিল সেদিন। তৎকালীন আকাশবাণীর একজন জনপ্রিয় উপস্থাপক মিহির বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিনের ঘটনার চাক্ষুষ বর্ণনা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'দেবীদুর্গতিহারিণী' অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারের মাঝপথেই টেলিফোনে শ্রোতাদের অবর্ণনীয় গালিগালাজ আসতে শুরু করে। অনুষ্ঠান শেষ হতে না হতেই আকাশবাণী ভবনের সামনে জড়ো হয় বিশাল জনতা। ফটকে দাঁড়িয়ে থাকা প্রহরীরা সামাল দিতে হিমশিম খেয়ে যান। ফটকের গেট ভেঙে ঢুকে পড়তে চায় উত্তাল মানুষের ভিড়।'

শেষে জনরোষ সামলাতে না পেরে, জনগণের দাবিতে আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ সেই বছরই মহাষষ্ঠীর দিন পুনরায় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের ভাষ্যপাঠে রেকর্ড করা আগের 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার করতে বাধ্য হয়।

দ্বারহাটা শিশুমন্দিরে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠান

হুগলী জেলার দ্বারহাট্টা গ্রামে ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় সরস্বতী শিশুমন্দিরের স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠান গত ১৪ থেকে ১৫ আগস্ট নিজ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দুদিন দেশাত্মবোধক সংগীত, নৃত্য, অঙ্কন আবৃত্তি, প্রশ্নমঞ্চ (কুইজ) ও যোগাসন প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতায় পাশ্ববর্তী ও দূরবর্তী বিভিন্ন বিভাগে ৪৩৮ জন অংশগ্রহণ করেন। ১৫ আগস্ট জাতীয় পতাকা উত্তোলনে ৪৫ জন ভাই-বোন স্বাধীনতা সংগ্রামী সাজে সজ্জিত হয়ে, ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও প্রাক্তন ভাই-বোনেদের নিয়ে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সারা গ্রাম পরিক্রমা করে।পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত চিলেন দ্বারহাট্টা রাজেশ্বরী ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক গোপাল চন্দ্র ঘোষ। শিশুমন্দিরের প্রধান আচার্য কৌশিক দুলে সারা বছরের প্রতিবেদন পাঠ করেন। প্রধান অতিথি শ্রীঘোষ শিশুমন্দির থেকে পাশ করে তাঁর স্কুলেভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের আচার আচরণের প্রশংসা করে স্বাদীনতার অমৃত মহোৎসব পালনের ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন। সমস্ত প্রতিযোগিতার স্থানাধিকারীদের হাতে উপহার ও শংসাপত্র তুলে দেন উপস্থিত অতিথিগণ। প্রতিযোগীদের উপহার দিয়ে সহযোগিতা করেন আনমোল ইন্ড্রাটিজ লিমিটেড, ডানকুনি। শিশুমন্দিরের সভাপতি ডাঃ বনমালী ভড়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রে শ্রীঅরবিন্দের সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন

বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে গত ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে বেহালা গার্লস হাইস্কুলে শ্রীঅরবিন্দের সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সভাপতি স্বপন কুমার ঘোষ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. প্রিয়ঙ্কর আচার্য। বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী রিপন সাহা পরিবেশিত 'মহারাজা একি সাজে' উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেন পাঠচক্রের সম্পাদক সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাপতি শ্রীঘোষ পাঠচক্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। প্রধান অতিথি ড. আচার্যের নাতিদীর্ঘ বক্তব্য সকলকে সমৃদ্ধ করে। পাঠচক্রের সদস্য প্রতাপ রায় 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার' খুব দক্ষতার সঙ্গে আবৃত্তি করেন। পাঠচক্রের সদস্যা রিত্রা রায় শ্রীঅরবিন্দের লেখা ইংরেজি কবিতা পাঠ করে অনুষ্ঠানের মাধুর্য বৃদ্ধি করেন। অনুষ্ঠান সুচারু রূপে সঞ্চালনা করেন পাঠচক্রের সদস্য শ্রীঅঙ্কুর কোনার।

দক্ষিণ কলকাতা মাহেশ্বরী সভার উদ্যোগে ফুটবল টুর্নামেন্ট

দক্ষিণ কলকাতা মাহেশ্বরী সভার উদ্যোগে গত ২৬ আগস্ট কলকাতা এবং আশপাশ এলাকায় বসবাসকারী মাহেশ্বরী পরিবারের ১২ থেকে ৫৫ বছর বয়েসি খেলোয়াড়ের এক ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয় কলকাতার এক্সল টপ ময়দানে। নিলামির মাধ্যমে সমস্ত দল চয়ন করা হয়। টুর্নামেন্টের প্রযোজক ঝারোকা বুটিক এক্সক্লুসিভ ফ্রম জয়পুর (সুনীতা লাহোটী), টি শার্ট স্পন্সরার সম্পত মন্ধনা এবং ফুড পার্টনার ডেলিভেরিং হ্যাপিনেস হোম বেকারি (অঞ্জু লাখোটিয়া), টিম মালিক মন্নাকৃষ্ণা প্লাইউড (রাজেন্দ্র গগ্গড়), নেপক্লাউড (হিমাংশু মেহতা, এ এম মোবাইল(সঞ্জয় লড্ঢা, মাকা টি (সঞ্জীত লাখোটিয়া, ও অম্বে ট্রাভেলস (আশীষ অগ্রওয়াল)-এর খোলায়াড়রা দর্শকদের

মুগ্ধ করেন। বিজেতা টিম নেপক্লাউড নিংজস এবং উপবিজেতা টিম মাকা টি স্ট্রাইকার্সকে ঝারোকা এমপি অল ট্রফি প্রদান করা হয়। টুর্নামেন্ট চলাকালীন পশ্চিমবঙ্গের দৃষ্টিশক্তিহীন খোলোয়াড়দের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। স্বর্ণয়াম ফাউন্ডেশনের রবি বিষ্ণু চৌমাল মাহেশ্বরী সভার উদ্যোক্তাদের এই আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বহু প্রতীক্ষিত এই ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য সভার অধ্যক্ষ অরুম লড্ঢা দিলীপ লাহোটী, প্রবীণ গগ্গড় ও অভয় সোমানীর প্রয়াসের প্রশংসা করে সূরজ নাগোরী, হরীশ জাজু, প্রতীক গগ্গড়, রমেশ চাণ্ডক ও গিরিরাজ চিৎলাঙ্গিয়াকে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান। বিভিন্ন ক্ষেত্রের গণ্যমান্যব্যক্তিবর্গ এই টুর্নামেন্ট দর্শনে ময়দানে উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সৎসঙ্গ বর্গ

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সৎসঙ্গ বর্গ গত ২৭,২৮,২৯ আগস্ট আলিপুরদুয়ার জেলার জয়গাঁর সৎসঙ্গ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। বর্গে ৪৮ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় সৎসঙ্গ প্রমুখ বসন্ত রথ, প্রান্ত সম্পাদক লক্ষ্মণ বনসল, প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক অনুপ কুমার মণ্ডল, প্রান্ত সহ সভাপতি শ্যামটী বর্মা এবং প্রান্ত সৎসঙ্গ প্রমুখ প্রদীপ থাপা।

বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের প্রাদেশিক কার্যকারিণী বৈঠক

গত ৭ আগস্ট কলাকাতার মানিকতলার নরেশ ভবনে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের প্রাদেশিক কার্যকারিণী বৈঠক সম্পন্ন হয়। বৈঠকে ১৮টি জেলার ৪১ জন শিক্ষক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। গত ১ আগস্ট যে প্রায় দেড়হাজার বিদ্যালয়ে ভারতমাতার পূজা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণ ও তর্পণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, এই বৈঠকে জেলা কার্যকর্তারা তার বিস্তারিত বর্ণনা করেন। বৈঠকে সদস্য সংগ্রহ অভিযান ও স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে আলোচনা সভার রূপরেখা নিয়ে পথনির্দেশ করেন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপী প্রামাণিক। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক ড. জয়ন্ত রায় চৌধুরী বৈঠকে উপস্থিত থেকে সংগঠনের কাজ সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করেন। শেষে পূর্বক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক আলোক চট্টোপাধ্যায় কার্যকর্তাদের আত্মসমীক্ষার উল্লেখ করেন। রাজ্য সহ সভাপতি শিবমণি সাউ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মালদা বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরে রক্তদান শিবির

গত ১১ আগস্ট ভারতমাতার বীর সন্তান ক্ষুদিরাম বসুর বলিদান দিবস এবং স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে মালদা জেলার বাচামারী গভঃ কলোনিস্থিত বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে শিবিরের উদ্বোধন করেন মালদহ মেডিক্যাল কলেজের ডেপুটি সিএমওএইচ ডাঃ অমিতাভ মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন শিশুমন্দিরের সম্পাদক, অভিভাবক ও প্রাক্তন বিদ্যার্থীরা। শিশুমন্দিরের প্রধান আচার্য স্বাগত বক্তব্য রাখেন। শিশুমন্দিরের অভিভাবক, আচার্য-আচার্যা, সম্পাদক কোষাধ্যক্ষ এবং প্রাক্তন বিদ্যার্থী-সহ মোট ৫৭ জন রক্ত দান করেন।

বিদ্যালয়ে ভারতমাতা পূজা

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ ১ আগস্ট দেশজুড়ে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদ্‌যাপন করার যে যোজনা গ্রহণ করেছিল তারই অঙ্গ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের উদ্যোগে দেড়হাজার উচ্চ বিদ্যালয়ে ভারতমাতার পূজন এবং শিক্ষক স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কর্ম ও জীবন নিয়ে আলোচনা করা হয়। এদিন বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে ভারতমাতার ছবি ও শিক্ষক স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ছবি সংবলিত ক্যালেন্ডার বিতরণ করা হয়। সংগঠনের রাজ্য সাদারণ সম্পাদক বাপী প্রামাণিক জানান, রাজ্যের ২০টি জেলার ৫২টি মহকুমার ১৯৫টি ব্লকের ১৮৭৮টি উচ্চ বিদ্যালয়ে এইভাবে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব পালন করা হয়। এতে ৩০১টি গ্রুপে ৬১০ জন শিক্ষক কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রকারী সবাইকেই শংসাপত্র দেওয়া হয়। কমিটির সভাপতি রঘুনাথগঞ্জ হাসাপাতালের চিকিৎসক ডাঃ অমিত বেরা এবং সম্পাদক বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠভবনের অধ্যাপক ড. নিবিড় কুমার ঘোষের পরিচালনায় এই অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

অযোধ্যা নগরীতে গঙ্গা সমগ্র রাষ্ট্রীয় অভ্যাস বর্গ

গত ২০,২১,২২,ও ২৩ আগস্ট উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা নগরীতে চারদিনের গঙ্গা সমগ্রের রাষ্ট্রীয় অভ্যাস বর্গ সম্পন্ন হলো। গঙ্গা সমগ্রের প্রতিষ্ঠা হয় ২০১২ সালের ২৮ আগস্ট। ভারতের প্রধান নদী গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করাই এই সংস্থার মূল লক্ষ্য। গুজরাট, বিহার ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে পুরুষ মহিলা-সহ তিনশোর বেশি কার্যকর্তা এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। গঙ্গা-সহ ভারতের বিভিন্ন নদ-নদী কীভাবে সংস্কার করা যায় তা রাজ্যভিত্তিক আলোচনা করা হয়। নদী সংস্কারের জন্য কতগুলি পর্ব রয়েছে। যেমন, ঘাট সংস্কার, বৃক্ষ রোপণ, আরতির মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি। বিশিষ্ট কর্মকর্তা অমরিন্দর সিংহ বলেন, এই সংস্থার নাম গঙ্গা সমগ্র হলেও ভারতের সমস্ত নদ-নদীর সংস্কারই এর লক্ষ্য। ২২ তারিখ সন্ধ্যায় মহা ধুমধাম-সহ গঙ্গা আরতি সম্পন্ন হয়। ২৩ তারিখে সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন হনুমানগড়ির মোহন্ত পূজ্যপাদ রাজকুমার দাস, অযোধ্যার আইজি কে পি সিংহ এবং গঙ্গা সমগ্রে রাষ্ট্রীয় সম্পাদক রামশঙ্কর সিংহ। বক্তারা গঙ্গা মাহাত্ম্যর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন।

মা মনসা লৌকিক দেবী

মিলন খামারিয়া

মনসা হলেন লৌকিক হিন্দু দেবী। 'দেবী ভাগবত' পুরাণ-সহ আরও অনেক পুরাণে দেবী মনসার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি সর্পদেবী। প্রধানত বাঙ্গলা, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে তাঁর পূজা প্রচলিত আছে। সর্পদংশন থেকে রক্ষা পেতে, সর্প-দংশনের প্রতিকার পেতে, প্রজনন ও ঐশ্বর্যলাভের উদ্দেশ্যে তাঁর পূজা করা হয়। মনসার ঘট স্থাপন করে বা মূর্তি তুলে তাঁর পুজো করা হয়। মনসা নাগ-রাজ (সর্পরাজ) বাসুকীর ভগিনী এবং ঋষি জরৎকারুর স্ত্রী। মনসা ছাড়া তাঁর অন্য নামগুলি হলো বিষহরি বা বিষহরা (বিষ ধ্বংসকারিণী), নিত্যা (চিরন্তনী) ও পদ্মাবতী।

পুরাণ অনুসারে, মনসা হলেন শিবের স্বীকৃতকন্যা ও জরৎকারুর পত্নী। জরৎকারু মনসাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। মনসার মা চণ্ডী (শিবের স্ত্রী পার্বতী) তাঁকে ঘৃণা করতেন কিন্তু পরবর্তীতে মাতা চণ্ডী মনসাকে নিজের মেয়ের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। মনসাকে ভক্তবৎসল বলে বর্ণনা করা হলেও, যিনি তাঁর পূজা করতে অস্বীকার করেন, তাঁর প্রতি তিনি অত্যন্ত নির্দয়। জন্ম-সংক্রান্ত কারণে মনসার পূর্ণ দেবীত্ব প্রথমে অস্বীকার করা হয়েছিল। তাই মনসার উদ্দেশ্য ছিল দেবী হিসেবে নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করা এবং একটি একনিষ্ঠ ভক্তমণ্ডলী গড়ে তোলা। তাঁর সঙ্গে মিশরীয় দেবী আইসিসের মিল রয়েছে।

মনসা, কেতকা, পদ্মাবতী— এই নামেই মনসাদেবী সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনিই মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাই এই কাব্যকে 'মনসাঙ্গল' বা 'পদ্মাপুরাণ' বলা হয়। মনসা প্রাক্-পৌরাণিক দেবী। তিনি প্রাচীন পুরাণে স্থান পাননি অথচ লোকব্যবহারে ও লোকসাহিত্যে বিভিন্ন রূপ পরিবর্তন করে চলে আসছেন। অবশ্য কোনো কোনো প্রাচীন হিন্দু পুরাণ ও বৌদ্ধ গ্রন্থে সর্পদেবী মনসার বর্ণনা আছে। পদ্মাপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও দেবীভাগবতে মনসার উল্লেখ রয়েছে। সংস্কৃত পুরাণ সাহিত্যে মনসা একবার ঈষৎ ধরা দিয়েছিলেন। সেটা মহাভারতের আদিপর্বে জনমেজয়ের সর্পসত্রের পূর্বপ্রসঙ্গক্রমে। কিন্তু প্রাচীন পুরাণ ও মহাভারতে যে সর্প দেবীর উল্লেখ আছে সেখানে তিনি হচ্ছেন জরৎকারুর স্ত্রী। আস্তিক তাঁর ছেলে। মহাভারতে মনসার ও তাঁর স্বামীর নাম একই— জরৎকারু। 'মনসা' দেবীর ভাবনা অতি প্রাচীনকালেও অজ্ঞাত ছিল না। একটি শ্লোকে মনসা দেবীর ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ত্রী সপ্ত ময়ূর্যঃ সপ্ত স্বসারো অগ্রু বঃ।

তাস্তে বিষং বিজভ্রির উদকং কুম্ভিনীরিব।।

'তিন সাত ময়ূরী, সাত ভগিনী কুমারী, তাহারা তোমার বিষ তুলিয়া লইতেছে, যেমন কলসীকাঁখে মেয়েরা (কুপ হইতে) জল (লইয়া যায়)।'

পুরাণে তাকে ঋষি কশ্যপ ও নাগ-জননী কদ্রুর কন্যা বলা হয়েছে। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী নাগাদ মনসা প্রজনন ও বিবাহের দেবী হিসেবে চিহ্নিত হন এবং শিবের আত্মীয় হিসেবে শৈব দেবমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হন। কিংবদন্তী অনুসারে, দেবাদিদেব মহাদেব সমুদ্র মন্থনে উত্থিত বিষ পান করার পর মনসার মধ্যে তা সঞ্চার হয় এবং মনসা 'বিষহরী' নামে পরিচিত হন। মনসার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং তা দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে মনসা-কেন্দ্রিক ধর্মীয় গোষ্ঠীটি শৈবধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়। এর ফলে শিবের কন্যারূপে মনসার জন্মের উপাখ্যানটি রচিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত শৈবধর্মও এই অন্ত্যজ শ্রেণীর দেবীকে হিন্দুধর্মের মূলধারার অন্তর্ভুক্ত করে।

মনসার কাহিনি পঞ্চদশ শতাব্দী শেষ হবার আগেই পরিপূর্ণ পাঁচালিরূপ ধারণ করেছিল। এর ইঙ্গিত পাওয়া যায় বিপ্রদাস পিপলাইয়ের 'মনসাবিজয়' কাব্যে। বিপ্রদাসের কাব্যখানি রচিত হয়েছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে।

বাস্তুদেবতার, আরোগ্যের দেবতা অথবা সম্পদের দেবতা— এই বিভিন্ন নামে মনসার পূজা এদেশে বরাবর চলে এসেছে। এখন তিনি বিশেষ করে সাপের দেবতা, তবে নিজে সাপ নন।

পদ্মদলে মনসার উৎপত্তি। মনসার মূর্তিতে তাকে সর্প-পরিবেষ্টিত নারী রূপে দেখা যায়। তিনি একটি হংস বা পদ্মের উপর বসে থাকেন। তাঁর বাহন হাঁস ও সাপ। তাঁর চার হাত। উপরের দুটি হাতে থাকে পদ্ম ও নীচের দুটি হাতে থাকে সাপ। সাতটি সাপের ফণা তাঁর মাথার উপর ছত্রাকারে বিরাজ করে। কোনো কোনো মূর্তিতে তাঁর কোলে একটি শিশুকে দেখা যায়। এই শিশুটি তাঁর পুত্র আস্তিক। তাকে 'একচক্ষু-বিশিষ্টা দেবী' বলা হয়। মনসার মা চণ্ডী ক্রোধের বসে তাঁর একটি চোখ পুড়িয়ে দিয়েছিলেন।

মানব সমাজের গতি অর্থাৎ প্রবহমানতার মাধ্যম হলো সৃষ্টি। তাই 'মনসার ঘট' হলো গর্ভবতী নারীর প্রতীক। যেখান থেকে প্রাণ সঞ্চার হয়ে মানব জীবন ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে এগিয়ে চলছে। মনসা ঘট যেমন গর্ভবতী নারীর প্রতীক তেমনই ফসলের উর্বরতারও প্রতীক, যাকে প্রজনন শক্তির প্রতীক হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে।

সাধারণত মনসার মূর্তি পূজা হয় না। সীজ বৃক্ষের শাখায়, ঘটে বা সর্প-অঙ্কিত ঝাঁপিতে মনসার পূজা হয়। তবে কোথাও কোথাও মনসার মূর্তিও পূজিত হয়। বঙ্গপ্রদেশেই মনসার পূজা সর্বাধিক জনপ্রিয়। বিজয়গুপ্তের গৈলা-ফুল্লশ্রী (বর্তমান-বাংলাদেশ) গ্রামে এখনো মা মনসার মন্দির আছে। এই অঞ্চলে অনেক মন্দিরে এখনো বিধিপূর্বক মনসার পূজা হয়। বর্ষাকালে যখন সাপের উপদ্রব বৃদ্ধি পায়, তখন মনসার পূজা মহাসমারোহে হয়ে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে পুরো শ্রাবণ মাস জুড়েই মনসা পূজা হয়। পুজো উপলক্ষ্যে হয় পালা গান 'সয়লা'। এই পালার বিষয় হলো— পদ্মপুরাণ বা মনসামঙ্গল। সারা রাত ধরে গায়ক দোয়ারপি-সহ পালা আকারে 'সয়লা' গান গায়। পুরুলিয়ায় মনসা পূজায় হাঁস বলি দেওয়া হয়। রাঢ় বাঁকুড়ায় জ্যেষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে দশহরা ব্রত পালন করে মনসা পূজা করা হয়। তখন এখানে ঘুড়ি ওড়ানো হয়। মনসা পূজার অঙ্গ হলো অরন্ধন। রাঢ়ে চৈতন্যদেবের সময়ে মনসাকে মা দুর্গার এক রূপ মনে করা হতো। তাই কোনো কোনো জায়গায় পূজায় বলি দেওয়া হতো। আজও অনেক পূজায় পাঁঠা বলি হয়।

উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে রাজবংশী সমাজের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দেব-দেবীর অন্যতম হলেন মনসা। প্রায় প্রত্যেক কৃষক গৃহেই মনসার 'থান' বা বেদী দেখা যায়। দক্ষিণ দিনাজপুরের ফুলঘড়ায় শরৎকালে দুর্গাপূজার পরিবর্তে মনসা পূজা হয়। ৩০০ বছরের বেশি সময় ধরে মনসা পূজা হচ্ছে। পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের মধ্যেও মনসাপূজা বিশেষ জনপ্রিয়।

বাঙ্গলার বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যেও মনসাপূজা বিশেষ প্রচলিত। এর কারণ মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদ সদাগর, যিনি প্রথম মনসার পূজা করেছিলেন, তিনি ছিলেন একজন বণিক। এই কাব্যের নায়িকা বেহুলাও সাহা নামক এক শক্তিশালী বণিক সম্প্রদায়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

ভারতের অসম রাজ্যেও মনসাপূজা বিশেষ জনপ্রিয়। এই রাজ্যে ওজা-পালি নামে একধরনের সংগীতবহুল যাত্রাপালা সম্পূর্ণ মনসার কিংবদন্তীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। নাগপঞ্চমী তিথি, শ্রাবণ সংক্রান্তি, ডাক সংক্রান্তি ও অন্যদিনে মনসার বিধিপূর্বক পূজা প্রচলিত। এই উৎসবটি হলো একটি সর্পকেন্দ্রিক উৎসব। হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে শ্রাবণ (জুলাই-আগস্ট) মাসে এই উৎসব পালিত হয়। বাঙ্গালি মেয়েরা এই দিন উপবাস করে ব্রত পালন করেন এবং সাপের গর্তে দুধ ঢালেন।

তাই দেখা যাচ্ছে, দেবী মনসার মাহাত্ম্য কথা পশ্চিমবঙ্গ তথা সারাদেশ জুড়েই ছড়িয়ে রয়েছে। নদীয়া জেলার রানাঘাট-১ ব্লকের কালীনারায়ণপুর-পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়পুর গ্রামও তার ব্যতিক্রম নয়। এবার চারদিন ধরে এই গ্রামে মনসা পূজার আয়োজন করেছিলেন বিভিন্ন পুজো উদ্যোক্তারা। রীতিমতো প্যান্ডেল খাটিয়ে এই গ্রামে মনসার পূজা হয় মূর্তি তুলে। আশেপাশের গ্রামের মানুষ মনসা পূজা উপলক্ষ্যে আয়োজিত মেলা দেখতেও আসেন। সর্পদেবী মনসার এতো জাঁকজমকপূর্ণ পূজা সাধারণত বিরল বলা যায়।

এ বছর জয়পুর গ্রামে মোট দশটি বড়ো পুজো হচ্ছে। তারমধ্যে অন্যতম বড়ো পুজো হলো জয়পুর স্পোর্টিং ক্লাব। এই ক্লাবের মনসা পূজা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে ক্লাব সেক্রেটারি ভবতোষ বিশ্বাস জানান যে, 'গত একশো বছরের বেশি সময় ধরে আমাদের গ্রামে মা মনসার পুজো হচ্ছে। তবে জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে হচ্ছে গত ২৪ বছর ধরে। আশেপাশের হবিবপুর, রানাঘাট, বীরনগর, তাহেরপুর, পায়রাডাঙা প্রভৃতি স্থান থেকে অনেক মানুষ এই পুজো দেখতে আসেন। আমাদের ক্লাবের মাঠে একটি মেলা বসে। অনেক মানুষের রুজিরোজগার হচ্ছে এই পুজো উপলক্ষে। পাশাপাশি মানুষের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি ও দেবী মনসার মাহাত্ম্যও প্রচারিত হচ্ছে। আমরা চাই যে— এই পুজো প্রচারের আলোয় আসুক এবং আরও মানুষের সমাগমের মাধ্যমে আমাদের জয়পুর গ্রামের পুজো এক মহামিলন মেলায় পরিণত হোক।'

মনসা গীতবাদ্যপ্রিয়— গান-বাজনা না হলে তার পূজা হয় না এবং এই গীতনৃত্য করেই বেহুলা তাঁর (মনসার) প্রসাদ লাভ করে লক্ষ্মীন্দরকে পুনর্জীবিত করতে পেরেছিলেন।

দেবী মনসার মাহাত্ম্য কথা জনসমাজে বহুল প্রচলিত আছে। জয়পুরের পুজো এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে তার প্রমাণ দিয়ে চলেছে। বহু মানুষ এই পুজো উপলক্ষ্যে আয়োজিত 'ভাসান গান বা মনসার গান' শুনতেও দূরদূরান্ত থেকে আসেন বলে জানা যায়। □

সাংখ্যদর্শনের মূলকথা
আমিত্বের বিসর্জনেই ত্রিতাপের অবসান

কৃষ্ণচন্দ্র দে

হাজার হাজার বছর ধরে বেদ ও তার সিদ্ধান্ত ছিল হিন্দু জাতির জীবনচর্যা ও জীবনবেদ। জগৎটা যে একটা শৃঙ্খলাহীন বস্তু সমষ্টি নয়, প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে প্রত্যেক বস্তুর যে একটা নিবিড় সম্পর্ক বা যোগাযোগ আছে, সমস্তই যে এক মূল প্রকৃতির সৃষ্টি সন্তান, প্রকৃতির পরিণাম হতে যে এই নিখিল বিশ্বের ক্রমবিকাশ ও ক্রমাভিব্যক্তি এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় আর্য ঋষিদের এই শুভ প্রয়াসের ফলশ্রুতিতে দর্শনের সৃষ্টি।

ছয়খানি সূত্রগ্রন্থের উপর ছয়টি দর্শন প্রতিষ্ঠিত। জগতের কারণ সম্বন্ধে অনেক তর্ক-বিতর্ক ও তা সম্বন্ধে অনেক মীমাংসা দর্শন প্রণেতারা সুচারু রূপে সম্পন্ন করলেন। তার মধ্যে ছয়খানি দর্শন ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। এই ছয় দর্শনই কালক্রমে ষড়দর্শন নামে অভিহিত হলো।

সাংখ্যদর্শন, পাতঞ্জল বা যোগদর্শন, ন্যায় দর্শন, বৈশেষিক দর্শন পূর্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংশা বা বেদান্ত দর্শন।

বহু বছর আগে বেশকিছু তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ, পরিচয় ও ভাবের আদান প্রদান এবং তত্ত্বালোচনার সুযোগ ঘটেছিল। তাঁদের মধ্যে অন্যতম যোগাচার্য ভবানন্দ গিরি মহারাজ (তৈলটকা, মেদিনীপুর), ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজ (শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গন, রঘুনাথপুর ভি.আই.পি. রোড কলকাতা-৫৯), যোগীরাজ ব্রহ্মানন্দ পরমহংস (বারাণসী কাশীধাম) ও মহামণ্ডলেশ্বর বিষ্ণুপুরী মহারাজ। এই বিষ্ণুপুরী মহারাজ একবার বাটানগরে শিবমন্দিরে প্রায় মাসাধিককাল শঙ্কর জয়ন্তী উপলক্ষ্যে গীতাযজ্ঞ করেছিলেন। বাটানগরের বাসিন্দা হিসেবে এই কর্মযজ্ঞে শামিল থাকতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। বর্তমানে তাঁর পরমার্থসাধক সঙ্ঘের আশ্রম যাদবপুরের সন্নিকটস্থ রামগড়ে অবস্থিত আছে। ওই উৎসবে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে শুরু করে বহু মহারাজ এবং হরিপদ ভারতীর মতো পণ্ডিত

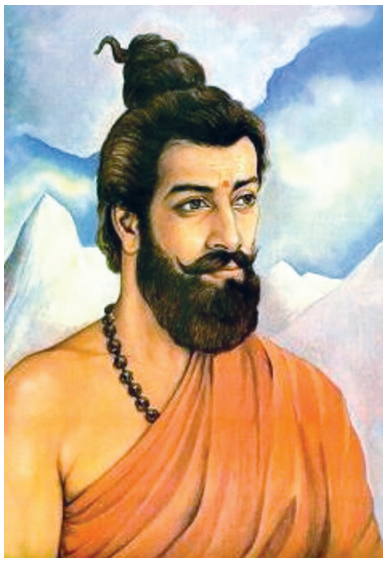

প্রবর মানুষের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ ঘটেছিল। ওই সমস্ত দিকপাল পণ্ডিতদের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে যে তত্ত্ব ও সত্যের সন্ধান লাভ করেছিলাম তা আমার জীবনে এক বিরাট সঞ্চয় হয়ে রয়ে গিয়েছে। সেই অভিজ্ঞতার এই প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করেই।

সাংখ্যদর্শন : কপিলমুনি এই দর্শন রচয়িতা। এখানে পুরুষার্থের বিষয় ও ত্রিতাপ জ্বালার নিবৃত্তি বিষয় বিশদে লিপিবদ্ধ আছে। সাংখ্যদর্শন ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়— বিষয় নিরূপণ, দ্বিতীয় অধ্যায়— প্রকৃতির কার্যকারণ, তৃতীয় অধ্যায়— বিষয় বৈরাগ্য, চতুর্থ অধ্যায় বিষয়— বিরাগী মুমুক্ষুগণের সম্বন্ধে পিঙ্গলা নাম্নী গণিকা এবং করবী নাম্নী পক্ষিণীর আখ্যায়িকা। পঞ্চমে পাপক্ষয় বর্ণনা এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে সকলের সামান্য অর্থ ও প্রকৃতি ও পুরুষের বিচার জ্ঞান কথিত হয়েছে।

কপিলমুনি বলেছেন— 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ'। এর অর্থ ঈশ্বর নাই— এটা সম্পূর্ণ ভুল। এর প্রকৃত অর্থ হলো— ঈশ্বর বাক্য ও মনের অগোচর। কপিল যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দিহান হতেন তবে তিনি 'ঈশ্বরাভাবৎ' বলতেন। অর্থাৎ ঈশ্বরের অভাব। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই কমিলমুনিকে নিরীশ্বরবাদী বলে দাগিয়ে দিয়েছেন। আগেই বলেছি ত্রিতাপে নিবৃত্তিই মানবাত্মার মুখ্য উদ্দেশ্য। দুঃখ অর্থাৎ তাপ তিন প্রকার--- আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক।

আধ্যাত্মিক দুঃখ আবার দুই প্রকার--- শারীরিক ও মানসিক। বাত-পিত্ত, কফ্-শ্লেষ্মা, জ্বরাদি পীড়া, ধাতুর ব্যতিক্রমজনিত স্বরাতিসার প্রভৃতি রোগের ফলস্বরূপ শারীরিক দুঃখ হয়। আবার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ধনাদি প্রিয়জন ও প্রিয় পদার্থের বিয়োগ ও কলঙ্ক রটনাদি অপ্রিয় ঘটনার ফলে উদ্ভুত দুঃখ, মানসিক দুঃখ।

আবার জরায়ুজ, অন্তজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ জনিত চার প্রকার দুঃখকে আধিভৌতিক দুঃখ বলা হয়। প্রাকৃতিক কারণে যে দুঃখ হয় যেমন মহামারী, করোনা ভাইরাস প্রভৃতি কারণে উদ্ভুত দুঃখ আধিদৈবিক দুঃখ। মনুষ্য মাত্রেই এই ত্রিতাপ সন্তপ্ত। এই ত্রিতাপ হতে মুক্ত করাটাই সাংখ্যদর্শনের উদ্দেশ্য।

মহামুনি কপিল বলেছেন— পঞ্চবিংশতি (২৫) তত্ত্বের বিবেক জ্ঞানে এই দুঃখ দূর হয়। পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হলো প্রকৃতি, পুরুষ, মহতত্ত্ব, অহংকার তত্ত্ব ও মন, পঞ্চভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র।

প্রকৃতি হতে মহতত্ত্বের উৎপত্তি, মহতত্ত্ব হতে অহংকার, সত্ত্বগুণোদ্রিক্ত অহংকার হতে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও মনের উৎপত্তি হয়, রজোগুণোদ্রিক্ত অহংকার হতে পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চতন্মাত্র হতে পঞ্চমহাভূত হয়। উৎপত্তির ক্রম যথা : শব্দল তন্মাত্র হতে আকাশ, বায়ুর গুণ ও স্পর্শ। শব্দস্পর্শ ও রূপ তন্মাত্র হতে তেজ বা আগুনের উৎপত্তি, তেজের গুণ শব্দ-স্পর্শ ও রূপ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস তন্মাত্র হয়ে জলের উৎপত্তি, জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-তন্মাত্র হতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। সুতরাং পৃথিবীর গুণ— শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। উপরোক্ত পঞ্চ মহাভূত হতে চতুর্দ্দশ ভুবনের উৎপত্তি।

সাংখ্য শাস্ত্রের শেষ বচন এই— জড় দেহ নশ্বর, কিন্তু সূক্ষ্ম দেহ অবিনশ্বর। জড় দেহ থেকে আমিত্বকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলেই ত্রিতাপের অবসান হয়। অহংকার বা আমিত্ব জ্ঞান নষ্ট হলেই দেহ থেকে আমিত্বকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। জীবের অনিত্য জ্ঞান লাভ হয়। এই জ্ঞানই মুক্তি।

অযোধ্যার মারীচি মায়ের মন্দির

দেবাশিস চৌধুরী

তন্ত্রের উৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিতদের মতভেদ সর্বজনবিদিত। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন ঊষা ও নিশা নামের দুই দেবী সেই সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতার কাল থেকে পূজিতা হয়ে আসছেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন দেবীদ্বয়ের রূপ বদলেছে, তেমনই কখনো-বা তাঁরা মিশে গেছেন বৌদ্ধতন্ত্রের সঙ্গে। আবার কখনো আর্য-অনার্য দ্বন্দ্বে হয়েছেন রাজ্যের প্রধানা দেবী অথবা অরণ্যবাসিনী। তবে দেশকালের ভিন্নতায় নাম-রূপের বদল যতই ঘটুক সন্তানের চোখে মা তো মা-ই। ভক্তমন তত্ত্বকথার বদলে মাকে মা বলে জেনেই শান্তি পায় যে।

অনেকদিন আগে একটি দৈনিক ইংরেজি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, ওড়িশার বালেশ্বরের কাছে অযোধ্যা নামের এক গ্রামে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সাম্প্রতিক খননে আবিষ্কৃত হয়েছে বৌদ্ধযুগের প্রাচীন কিছু দেবীমূর্তি ও অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী। সামগ্রীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে একটি মারীচি মূর্তি। খবরটি পড়ার পর থেকেই ভেবে রেখেছিলাম কোনোদিন ওইদিকে গেলে একবার অযোধ্যায় যাব। তা মায়ের আশীর্বাদে একবার নয়, দু-দুবার গিয়েছিলাম ওখানে। প্রথমবার ২০০৫ সালে আর দ্বিতীয়বার ২০১৯ সালে। প্রকৃতপক্ষে বালেশ্বরকে কেন্দ্র করে দু-চার দিনের ভালো ট্যুর হয়ে যায়। সেই মতো দু'বারই ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে হাওড়া থেকে ট্রেনে বালেশ্বর রওনা দিয়েছিলাম।

স্টেশন নেমে একটা গাড়ি ভাড়া করে প্রথমে চললাম মাতৃদর্শনে। পথে পড়ল রেমুনার ক্ষীরচোরা গোপীনাথ ও ইমামি, জগন্নাথদেব মন্দির। মন্দির দর্শনান্তে ওই রাস্তা ধরে সোজা উদলার দিকে যেতে মিত্রপুর। এই মিত্রপুর থেকে একটু এগিয়ে রাস্তার পাশে পড়ে ব্লু-লেক বা নীল হ্রদ। লেকটির গভীরতা খুব বেশি হওয়ায় জলের রং নীলাভ আর সেই কারণে নামকরণ হয়েছে ব্লু-লেক বা নীল হ্রদ। লেকের পাশে স্বর্ণচূড়া পাহাড়। পাহাড়ের ছায়া পড়েছে লেকের বুকে। টলটলে স্বচ্ছ জলে ঢেউয়ের তালে ভাঙছে পাহাড়ের প্রতিচ্ছবি। লেকের ঠাণ্ডা জল হাতে মুখে মেখে উঠে বসলাম গাড়িতে। ব্লু-লেক থেকে টুকুসখানি এগিয়ে রাস্তা দু-ভাগ হয়েছে। ডানদিকের রাস্তা গেছে উদলার পানে, আমাদের গাড়ি চলল বাঁহাতি রাস্তায়। রাস্তা গিয়েছে সেই নীলগিরি পেরিয়ে পঞ্চলিঙ্গেশ্বর। এই রাস্তায় কিছুটা গিয়ে অযোধ্যা মোড় থেকে ডানহাতি রাস্তা ধরলাম। আঁকাবাঁকা রাস্তা একসময় শেষ হলো মারীচি মায়ের মন্দিরের সামনে।

বজ্রযান মতে মা মারীচি হলেন ভোরের দেবী অর্থাৎ প্রথম কিরণ বা আলোকরশ্মির দেবী। হরপ্পার দেবী মা ঊষাই কালক্রমে বৌদ্ধতন্ত্রে স্থান গ্রহণ করে মা মারীচি রূপে পূজিতা হয়েছেন কিনা তা পণ্ডিতদের গবেষণার বিষয়। মারীচি মায়ের মোট ছয়টি রূপভেদের কথা জানা যায়--- (১) অশোকাকান্তা, (২) আর্যা, (৩) অষ্টভুজাপিতা, (৪) দশভুজাসিতা, (৫) উভয়বরাহাননা এবং (৬) উদিয়ানা। তবে এই ছয়প্রকার রূপের মধ্যে মায়ের অষ্টভুজাপিতা নামক মূর্তিটি বেশি দেখা যায়। অযোধ্যার মারীচি মায়ের মূর্তিটিও অষ্টভুজাপিতা রূপের। এই রূপে মা ত্রিনয়না, ত্রিমস্তিকা ও অষ্টভুজা। মধ্য ও দক্ষিণ মস্তক ব্যতিরেকে মায়ের বাম মস্তকটি বরাহননা। মায়ের দক্ষিণ মুখমণ্ডলটির ভাব ক্রুদ্ধা ও মধ্যটি শান্তা। দেবী মূর্তির দু'দিকে মোট চারজন সঙ্গী বা উপদেবী দণ্ডায়মানা। (১) ভরতালি, (২) ভদলী, (৩) বরালী ও (৪) বরাহীমুখী। দেবী মারীচি একটি রথের উপর অধিষ্ঠিতা, রথটির বাহক সাতটি বরাহ। রথের চাকার তলায় পিষ্টাবস্থায় রাহুর অবস্থান।

ছোটো আড়ম্বরহীন মন্দির চত্বরে মারীচি মায়ের মন্দিরটি ছাড়াও রয়েছে আরও কয়েকটি মন্দির ও যজ্ঞস্থল। প্রতিটি মন্দিরে হয়ে চলেছে নিত্যপূজাও। গৌরবময় অতীতের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে চত্বরের একপ্রান্তে অনাদরে পড়ে থাকা ভগ্নপ্রায় ছোট্ট একটি বৌদ্ধস্তূপ। কিছুদিন আগে মন্দিরের গর্ভগৃহের ভিতর থেকে চুরি গেছে বরাহীমুখী মূর্তিটি।

মারীচি মা-কে প্রণাম করে চলে এলাম অনতিদূরের মিউজিয়মটিতে। অযোধ্যা থেকে খননে আবিষ্কৃত বৌদ্ধযুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি এখানে সংরক্ষিত রয়েছে। মিউজিয়ম থেকে সামান্য দূরে এক 'তেপান্তরের মাঠ'। এখানেই পুরাতত্ত্ব-বিভাগের খনন কার্য চলেছিল। মারীচি মায়ের মন্দির চত্বরের অদূরে রয়েছে একটি অতি প্রাচীন শিবমন্দির। গর্ভগৃহে তিনটি প্রাচীন মূর্তির মধ্যে দুটি বৌদ্ধ তন্ত্রের মাতৃমূর্তি— একটি মূর্তি সম্ভবত উগ্রতারার। এছাড়া হর-পার্বতীর ত্রিপাদ মূর্তিটি বিশেষ আকর্ষণীয়। শিবলিঙ্গটি গর্ভগৃহের মাঝখানে ছোটো গহ্বরের মধ্যে থাকায় খালি চোখে দৃশ্যমান নয়, টর্চ জ্বেলে দর্শন করতে হয়। ◻

সে ছিল একদিন আমাদের...

সুজিত রায়

সে ছিল একদিন আমাদের...

তখন আমাদের হাওড়ার গ্রামে ছিল প্রচুর গাছপালা। তখন সন্ধে হলেই ঝুপ করে ঝাঁপিয়ে পড়ত অন্ধকার। কারণ তখনও বিদ্যুৎ আসেনি আমাদের গ্রামে। ফলে মহালয়া আসার আগেই বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বোধ হতো আবহাওয়ায়, কিছুটা পরিবেশের কারণে। কিছুটা ভূতের ভয়ে।

আমার বেশ মনে পড়ে, আমি মহালয়ার চণ্ডীপাঠ শুনতাম আমার বড়দির কোলে বসে। বড়দি আমায় একটা বড়োসড়ো চাদর গায়ে দিয়ে জড়িয়ে রাখত। মহালয়া শুনব শুনব বাই ছিল। ভোরে ঘুম ছেড়ে উঠে পড়া— সেটাও হতো। কিন্তু বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের দরাজ কণ্ঠের সেই 'ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা' শুনতাম কম। ঘুমোতাম বেশি। পুজোর আগেই হালকা শীতের পদধ্বনি শোনা যেত সন্ধ্যার কলকাতাতেও।

টেলিভিশন সেট এল যখন তখন আমরা সব দিগ্‌গজ। লম্বা চওড়ায় বেড়েছি তো বটেই, চালচলনেও। তখন তো বড়দি কেন, মেজদিরও বিয়ে হয়ে গেছে। কারও কোলে বসার আদরের ঝোঁকটা ছিল না। ফলে যা হয় আর কী, মহালয়া টেলিভিশনের পর্দায় দেখা হতো কদাচিৎ। ১৯৭৯ থেকে কলকাতা দূরদর্শনে যখন 'তরুণদের জন্য' আসর পরিচালনার ভার পেলাম তখন আলাপ অনেকের সঙ্গেই। মহালয়া টিমের সঙ্গেও। কেমন হলো বন্ধুদের তৈরি মহালয়া সেটা দেখার আগ্রহ বাড়ল। তারপর তো খবরের কাগজের সাংবাদিক। তখন প্রতিবছর মহালয়ার সুপ্রভাতে প্রথম পাতায় একটা খবর এবং ছবি থাকতই। মহালয়ায় খবর। গঙ্গার ঘাটে তর্পণের ছবি। আজও থাকে। তবে সব খবরের কাগজে নয়। কারণ টেলিভিশনে তো সবাই সব দেখে নিয়েছে।

মহালয়া মানেই ছিল পুজোর ছুটি পড়ে যাওয়া। আমরা স্কুল থেকে সব নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরতাম। উৎসবে শামিল সবাই। কে আর পড়তে বসে! বসতেই হতো। তবে ওই উড়ো খই গোবিন্দায় নমো-র মতো করে সকাল সন্ধের প্রদীপ জ্বালানোর মতো। তখন প্রতিদিন একবার করে পুজোর জামাকাপড়গুলো প্যাকেট খুলে দেখতেই হতো— অন্য বন্ধুদের থেকে আমারটা কত ভালো হতো তা পরখ করার জন্য। একবার মনে আছে, কোনো কারণে

আমাদের মহালয়ার আগে নতুন জামাপ্যান্ট কেনা হলো না। সে কী মন খারাপ। রোজই ভাবি— বাবা হয়তো মাকে বলবে, আজ পুজোর বাজার করব। কিন্তু মহালয়া পার হয়ে গেল— দেবীপক্ষ বোধন হয়ে গেল। জামাপ্যান্ট হলো না। হলো, ষষ্ঠীর দিন সকালে।

এখন আমরা সব কলকাতাবাসী হয়ে ওঠার পর দিন যত এগিয়েছে উৎসবের ঔজ্জ্বল্য বেড়েছে ঠিকই। কিন্তু মনটা সেই হাওড়ার গ্রামের মতো নেই। শিশুরাও যেন নতুন জামাকাপড় নিয়ে ততটা উৎসাহী নয়। কারণ এখন তো কেনাকাটা সারাবছর। দোকানে যাওয়ারও বালাই নেই। সব অনলাইনে। আর আমরা? জামাকাপড় কিনতে যাওয়া মানেই তো খাওয়াদাওয়া। বারার পকেট ফাঁকা করে আমরা যে কী আনন্দ পেতাম সেসব এখনকার শিশুরা বুঝবেই না।

এখন তো আবার ডিজিটাল ইন্ডিয়া। আমি যে আবাসনে থাকি সেখানে আমার এক প্রতিবেশীর একটি বছর চারেকের ছেলে আছে। আমরা বলি মিষ্টিবাবা। ও সেদিন নিজে নিজেই পুজোর কেনাকাটা শুরু করে দিয়েছিল মোবাইলে। দুটো বন্দুকের অর্ডার তো পাকা। এরপর সবে একটা ল্যাম্বারগিনি গাড়ি অর্ডার করতে যাবে তো বাবার হাতে ক্যাচ কট কট। ভাবুন একবার, কী দুঃসাহস!

আমাদেরও দুঃসাহস ছিল। মহালয়া থেকেই নিত্যদিন পুকুরে ঝাঁপানো। গাছে ওঠা। বাড়ি থেকে চাল, ডাল, তেল চুরি করে পিকনিক করা। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার মহালয়াটা অন্যরকম। এখন মহালয়া তো মোবাইলেই।

ভয় হয় জানেন। ছেলে-মেয়েরা বড়ো হয়েছে তো। কোনদিন না অনলাইনে জ্যান্ত কার্তিক কিংবা সরস্বতীর অর্ডার না দিয়ে দেয়। মহালয়ার ভোরেই আমার ঘরেই শুরু হয়ে যায় উৎসবের বোধন! □

শুধু হাজতবাস নয়, কেষ্টদের জনবিচ্ছিন্ন করাও দরকার

সুপ্রভাত বটব্যাল

শুরু হয়েছিল গোছা গোছা টাকার বান্ডিল দিয়ে। তারপর থেকে টানা ৩০ দিন সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় জায়গা করে নিয়েছে রাজ্যের শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীরা। ২১ জুলাই রাতটুকু শুধু পার হয়েছিল। ২২ জুলাই সন্ধ্যা থেকে আর মুখ ফেরাতে হয়নি তৃণমূল কংগ্রেসকে। রাজ্য থেকে প্রকাশিত সমস্ত দৈনিকজুড়ে শুধুই তৃণমূল। টিভির পর্দায় চোখ রাখলে ভেসে আসছে দলের মহাসচিবকে তাক করে প্রান্তিক এক গৃহবধূর জুতো ছুঁড়ে দেওয়া। তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার আক্ষেপ নিয়ে আমতলার গৃহবধূকে বলতে শোনা গেছে, 'জুতো ছুঁড়বো না তো কী, পুজো করবো!'

করোনা কেড়েছে কবি শঙ্খ ঘোষের জীবন। সেই কবে, ২০১৯ সালে তিনি লিখে গিয়েছিলেন, 'যথার্থ এই বীরভূমি/উত্তাল ঢেউ পেরিয়ে এসে/পেয়েছি শেষে তীরভূমি। দেখ খুলে তোর তিন নয়ন/রাস্তা জুড়ে খড়্গ হাতে/দাঁড়িয়ে আছে উন্নয়ন...'। সেদিন গোরু পাচারে ইডি'র সমন পাননি বীরভূমের বাহুবলী নেতা। তাই কবির দিকে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য ছুঁড়ে দিতে দ্বিধা বোধ করেননি তিনি। গত পঞ্চায়েত ভোটের আগে বীরভূমের জেলা পরিষদের ৪২টি আসনই তৃণমূলের চাই বলে হুংকারের ছড়া লিখেছিলেন শঙ্খ ঘোষ। উন্নয়নকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দিদির হাতে কেষ্ট তুলে দিয়েছে গোটা বীরভূমকেই। কবির দেখার সুযোগ হয়নি। খড়্গ হাতে উন্নয়ন আর রাস্তায় নেই। আপাতত ঠিকানা তার জেলখানা। তাই লক্ষ লক্ষ উন্নয়নের কারবারিকে এখন দরকার মমতা ব্যানার্জির। এক উন্নয়ন জেলে, লক্ষ উন্নয়নকে রাস্তায় দাঁড়ানোর জন্য ডাক দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুব্রত এখন হেপাজতে। কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির হদিশ পাওয়া গেছে এবং এখনও যাচ্ছে। আর দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নেওয়া দলের সুপ্রিমো এখন এই অনুব্রতর মধ্যেই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের রক্ত খুঁজে পেয়েছেন। ফের স্বাধীনতার যুদ্ধে দলীয় কর্মীদের নামার ডাক দিয়ে মমতা ব্যানার্জি জানিয়ে দিয়েছেন, একটা কেষ্ট ধরলে, লক্ষ কেষ্ট রাস্তায় জন্মাবে। লক্ষ কেষ্টকে বাঙ্গলায় চাইছেন মমতা ব্যানার্জি। যে কেষ্টকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর, এতদিন ভয়ে সিঁটিয়ে থাকা নীচুপট্টির পড়শিরা পর্যন্ত চিৎকার করে বলেছেন, 'গোরু চোর'। বাড়ির বন্ধ দরজার সামনে গোরু বেঁধে দিয়ে গেছে ক্ষুব্ধ মানুষজন। ১০ বার সিবিআইয়ের জেরা এড়িয়ে, শেষে এসেছিলেন উডবার্ন ওয়ার্ডকে শেষ ভরসা করতে। সেখানেও তাঁকে শুনতে হয়েছে, 'এই গোরু চোর'। একজন অপরাধী নিজেকে 'অসুস্থ' প্রমাণ করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। জেরা এড়াতে হবে, তাঁর দায় আছে। জেরার পরে কী হয়, বলা যায় না। অপরাধী কলকাতার হাসপাতালে এসেছিলেন, চিকিৎসকরা বলেছেন তেমন কিছুই হয়নি। পার্থ চ্যাটার্জির ঘটনা থেকে তাঁরা শিক্ষা নিয়েছেন। কিন্তু অপরাধী অন্য কৌশল নিয়েছে। বীরভূমে ফিরে এসে সেখানের মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকদের বাধ্য করেছেন তাঁর বাড়িতে আসতে। বেশিক্ষণ সময় লাগেনি, দিনকাল খানিকটা বদলে যাওয়ায় সেই হাসপাতালের সুপারের সঙ্গে চিকিৎসকের কথার অডিয়ো সংবাদমাধ্যমের হাতে এসে গেছে। শোনা যাচ্ছে অনুব্রতর বাড়িতে যেতে অনিচ্ছুক সরকারি চিকিৎসককে সুপার নির্দেশ দিচ্ছেন তাঁর বাড়িতেই যেতে হবে। 'তিনি আমাদের ইয়ে', বলছেন সুপার। কী ইয়ে? কে অনুব্রত মণ্ডল? মন্ত্রী? রাজ্যপাল? সরকারি হাসপাতালের সুপার কেন তাঁর বাড়িতে যাবার জন্য চিকিৎসককে নির্দেশ দেবেন? কোন বিধিতে?

যে চিকিৎসক যেতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি সংবাদমাধ্যমে স্পষ্ট জানিয়েছেন তাঁকে বাধ্য করা হয়েছিল। কেন একজন সরকারি চিকিৎসককে বাধ্য করা হবে, এ প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। সাধারণ মানুষ ওই হাসপাতালেই দীর্ঘ সারিতে অপেক্ষা করেন, অনেক সময়েই বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হন। কলকাতার বড়ো সরকারি হাসপাতালে ডাক্তার দেখানোর বা ভর্তি হবার জন্য রাতের পর রাত অপেক্ষা করতে হয়। এমনকী জরুরি ক্ষেত্রেও চিকিৎসার অভাবে হাসপাতালের মধ্যে বা দরজায় রোগীকে প্রাণ হারাতেও দেখা গেছে অতীতে, সেখানে শাসক দলের জেলা সভাপতি বলে তাঁর বাড়িতে হাসপাতালের গাড়ি, ডাক্তার, নার্স যাবে কেন?

অনুব্রত ওরফে কেষ্ট মণ্ডলের বাড়িতে চিকিৎসক পাঠানোর আসল কারণ এমন একটি প্রেসক্রিপশন জোগাড় করা যেখানে লেখা থাকবে তিনি নড়াচড়া করতে পারছেন না। অনুব্রত 'বেড রেস্ট' চাইবেন জানাই ছিল, চেয়েছেনও। ডাক্তারবাবু চাপে পড়ে তা লিখেছেন। কিন্তু সত্য কথা জনসমক্ষে এনে দিয়েছেন সাহসের সঙ্গেই। অনুব্রতকে জেরার হাত থেকে বাঁচাতে কি শুধু অনুব্রতই চেয়েছিলেন? ওপরওয়ালারও ওপরওয়ালা আছেন। অনুব্রত গোরুচুরি, কয়লাচুরির কাণ্ডে

চুরি করে 'জেলে' গেলে মানসিকভাবে দুর্বল হয় একথাটা সত্যি— তাই এই সময়, এই সন্ধিক্ষণে চোরেদের, দুর্বৃত্তদের জেলে ভরার পাশাপাশি 'জনবিচ্ছিন্ন' করার লড়াইটাও ভীষণ জরুরি।

গোয়েন্দাদের জেরার মুখে পড়লে তৃণমূলের আরও বড়ো নেতাদের সমস্যা রয়েছে। ইংরেজিতে যাকে বলে 'হার্ডেন্ড ক্রিমিনাল', অনুব্রত তাই। কাজেই গড়গড় করে নাম বলতে থাকবেন বলে মনে হয় না। কিন্তু অনেক সূত্রই আসলে কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে রয়েছে, তাতে জাল কেটে বেরোনো মুশকিল।

কেষ্টদের বড়ো দরকার তৃণমূল নেত্রীদের। লুটেপুটে খাওয়ার পূর্বশর্তই হচ্ছে, গণতন্ত্রকে খতম করে, বাক্‌স্বাধীনতাকে স্তব্ধ করে ক্ষমতা দখল। গত ১০ বছরে দিদির মার্কশিটে সব্বাইকে হারিয়ে কেষ্টর স্কোর 'এ++'। তাই কেষ্ট কতটা নির্লোভ, তা প্রমাণ দিতে মরিয়া দিদি বলেছেন এমএলএ, এমপি এমনকী জনগণের সরাসরি ভোট এড়িয়ে অনুব্রত মণ্ডলকে রাজ্যসভায় পাঠাতে চেয়েও নাকি সফল হননি তিনি। কেষ্ট বাঙ্গালিকে বঞ্চিত করেছে। রাজ্যসভায় পাশাপাশি বসতেন কেষ্ট আর জহর সরকার। এমন নির্লোভ, অনাসক্ত অনুব্রত মণ্ডলের জন্য রাজ্যের উন্নয়ন মাঠে মারা গেল। কিন্তু উন্নয়ন থেমে নেই। গত ৩০ দিন ধরে খবরের কাগজের পাতাজুড়ে উন্নয়নের যজ্ঞে শামিল তৃণমূল। উঠে আসছে বিপুল সম্পদ তৈরির কাহিনি। গ্রামের খামারবাড়ি থেকে খাস কলকাতায় বিলাসবহুল আবাসন। কী নেই সম্পদের তালিকায়! বাড়ির পোষ্যকে রাখার জন্য পর্যন্ত আলাদা করে ৬০০ স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাট। সব আছে। কীভাবে গড়ে উঠেছে, এই বিপুল সম্পদ? তৃণমূলের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম সাংবাদিকদের কাছে অনুযোগের সুরে জানিয়েছেন, রোজগার করে কেউ যদি সম্পত্তি করে তাতে অন্যায় কোথায়?

মিথ্যার নির্মাণ তৈরি হচ্ছে প্রতি দিন। রাজ্যের মানুষের দাবি, তাদের কাজ, জীবন জীবিকার সমস্যা নিয়ে মাথাব্যথা নেই সরকার, শাসকদলের। প্রতি দিন আয়োজন হচ্ছে সাংবাদিক বৈঠকের। ঘুরিয়ে, ফিরিয়ে নেতা-মন্ত্রীরা আসছেন সেই বৈঠকে। সরকার কাজ নিয়ে নয়, আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ডুবে যাওয়া দলের নেতারা এখন বাঁচতে চাইছেন। আমি নই, ও দায়ী বলে এড়াতে চাইছেন সংগঠিত অপরাধের দায়কে। না হলে সাংবাদিক সম্মেলন করে কেউ বলতে পারে, আমাদের দলের সবাই

দুর্নীতি করেনি। কতিপয় করে থাকতে পারে।

গত ১১ বছরে এ রাজ্যে প্রতিটি অপরাধ সংগঠিত হয়েছে মাথার নির্দেশে। রাস্তায় ৫০০ দিন পার করে বসে থাকা হবু শিক্ষকদের চাকরি বিক্রি হয়েছে মাথার নির্দেশেই। কোনও একজনের ভূমিকায় নয়। সংগঠিত ভাবে নিয়োগের আকাশছোঁয়া দুর্নীতি হয়েছে এ রাজ্যে। ন্যূনতম অর্থের যোগ আছে, এমন কোনো সরকারি প্রকল্প বাদ নেই যেখানে শাসকদলের কাটমানি নেই। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রাপ্য ঋণও এখন কাঠমানির কবলমুক্ত নয়। অতিমারির সময় গোটা দেশে যখন লকডাউন চলছে, সেই সময়ও এ রাজ্যের গ্রামে গড়ে ২৫ লক্ষ করে শ্রমদিবস তৈরি হয়েছে বলে দেখানো হয়েছে। কোথায় গেছে এই বিপুল টাকা? 'মনরেগা হলো একটি চাহিদা ভিত্তিক কর্মসংস্থান প্রকল্প'— একথা আইনে বলা আছে, আমরা বেশিরভাগই তা জানি। ২০২০-২০২১ অর্থবর্ষে ১০০ দিনের কাজে কেন্দ্র আমাদের রাজ্যের জন্য বরাদ্দ করেছিল ১১ হাজার ৪৫৪ কোটি টাকা। ২০২১-২০২২ অর্থবর্ষে বরাদ্দ করা হয়েছিল ৭ হাজার ৫০৭ কোটি টাকা। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল-সহ ৩৩টি রাজ্যে অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল 'রেগা' প্রকল্পে (R.E.G.A ; Rural Employment Granted Assurance Scheme)। রেগা আইনের '২৭ নম্বর ধারায়' অর্থ 'নয়ছয় এবং অপব্যবহার'-এর কথাই বলা হয়েছে।

কিন্তু আমাদের রাজ্যে এই পরিমাণ বরাদ্দ অর্থ এত বেশি নয়ছয় ও অপব্যবহার হয়েছে যে, আইন মোতাবেক রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা না মানায় ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে আমাদের রাজ্যের জন্য আপাতত রেগার অর্থ বরাদ্দ বন্ধের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। 'নয়ছয় ও অপব্যবহারের' কথা প্রকৃতপক্ষে রাজ্য সরকারের মুখ্যসচিবের লেখা একটি নির্দেশনামায় সেই তথ্যই প্রমাণ করে। সর্বশেষ তথ্য বলছে— মেমো নং ৮৪ (৫৮)-এফ.বি, চিঠিতে রাজ্য সরকারের মুখ্যসচিব সমস্ত স্তরের প্রশাসনিক আধিকারীকদের জানাচ্ছেন যে, রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকারকে এখনও পর্যন্ত হিসাব দিতে পারেননি ২,৭০,৭৯৪ কোটি টাকার। এর মধ্যে পঞ্চায়েত, পৌর, শিক্ষা দপ্তরের (একটি অংশের) হিসাব বকেয়া সর্বাধিক। মোট বকেয়ার ৫৬ শতাংশ সি.এ.জি.-র মতে 'আশঙ্কা অপব্যবহারের'।

এক কেষ্ট 'জেলে' থাকতে পারে। লক্ষ কেষ্ট পথেই আছে। চোরকে তাই ধরে জেলে ভরতে পথে নামছে মানুষ। চোরকে জেলে যেতেই হবে। কিন্তু জেল কখনই স্থায়ী ঠিকানা হয় না। সারদা চিট ফান্ডে ৬৩৪ দিন জেল খেটে ফিরে এসে ফের বিধায়ক হয়েছেন মদন মিত্র। কুণাল ঘোষকে ৩৪ মাস পর জেল ফিরে, বর্তমানে জামিনে মুক্ত হয়ে দলের মুখপাত্র হতে দেখা গেছে। রোজভ্যালিতে ১৩৬ দিন জেল হওয়ার পর এখন সাংসদ সুদীপ ব্যানার্জি। তাই পার্থকে টেনে নিয়ে গেল, না, অনুব্রতকে টেনে নিয়ে গেল, না কালকে দিদিকে টেনে নিয়ে যাবে, না ববি হাকিমকে টেনে নিয়ে যাবে— লড়াইটা তার জন্য নয়। লড়াইটা আমার আপনার ভবিষ্যৎ, পশ্চিমবঙ্গ কোন জায়গায় যাবে জার জন্য। চুরি করে 'জেলে' গেলে মানসিকভাবে দুর্বল হয় একথাটা সত্যি— তাই এই সময়, এই সন্ধিক্ষণে চোরেদের, দুর্বৃত্তদের জেলে ভরার পাশাপাশি 'জনবিচ্ছিন্ন' করার লড়াইটাও ভীষণ জরুরি। এই কাজটা আমাদেরই করতে হবে। □

ক্রিকেটের নতুন দ্রোণাচার্যকে সম্মান দেখাতেই হবে

কৌশিক রায়

দেশপ্রেম আজাদ ও রমাকান্ত আচরেকর— এই দুই প্রশিক্ষক না থাকলে ভারতীয় ক্রিকেটের দুই নক্ষত্ররূপে কপিলদেব নিখাঞ্জ ও শচীন তেন্ডুলকররা হয়তো তৈরি হতে পারতেন না। ভারতীয় ক্রিকেটে সম্প্রতি এক নতুন দ্রোণাচার্যের উত্থান ঘটেছে। তিনি হলেন চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। ২০০১ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন ভারতের এই পূর্বতন উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। তারপর থেকে বেশ কয়েকটি দলকে নিজের চেষ্টাতে ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন করিয়েছেন চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। সেজন্যই তাঁকে দুই বিখ্যাত ফুটবল কোচ--- পেপে গোয়ার্দিওল ও অ্যালেক্স ফার্গুসনের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে।

চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের কোচিঙে এই প্রথম রঞ্জি ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হলো মধ্যপ্রদেশ। রমাকান্ত আচরেকরের কাছেই প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। ১৯৮৭-র রিলায়েন্স বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ভারতীয় ক্রিকেট দলে কিরণ মোরের পাশাপাশি উইকেটরক্ষকের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। ওই বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডের গ্রাহামগুচ, নিল ফস্টার, এডি হেমিংসন, এমব্যুরি, ফিলিপ ডিফ্রাইটাসদের মাপা বোলিংয়ের বিরুদ্ধে অসুস্থ দিলীপ বেঙ্গসরকারের বদলে খেলতে নেমে মোটামুটি ভালোই ব্যাটিং করেছিলেন চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। মুম্বাইয়ের হয়েও ঘরোয়া ক্রিকেট বেশ কয়েকটি বড়ো ইনিংস খেলেছেন তিনি। গত দুটি দশকে চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের কোচিঙে ৬টি রাজ্য রঞ্জি ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এই দলগুলির সবকয়টিই ক্রিকেটে সামনের সারিতে ছিল না। চন্দ্রকান্ত

পণ্ডিতের কোচিঙে ২০০৩ ও ২০০৪ সালে রঞ্জি ট্রফিতে শিরোপা অর্জন করে মুম্বাই। এরপরে রঞ্জি ট্রফিতে মহারাষ্ট্র, রাজস্থান ও কেরলকেও রঞ্জি ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন করান তিনি। চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের কোচিঙে ২০১৮ ও ২০১৯ সালে রঞ্জি ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হয় ঘরোয়া ক্রিকেটে কমজোরি দল বিদর্ভ। মধ্যপ্রদেশের অধিনায়ক— আদিত্য শ্রীবাস্তব স্বীকার করেছেন, চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের কোচিঙের জন্যই তাঁরা অপ্রত্যাশিতভাবে রঞ্জি ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হতে পেরেছেন। ৬০ বছর বয়স হলেও কর্মোদ্যমে মোটেই খামতি নেই চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের। প্রতিটি ম্যাচ হওয়ার আগে বিপক্ষ দলের খেলার নীতিপ্রকৃতি তিনি ভালোভাবে বিশ্লেষণ করেন। তাঁর কাছে খেলাটাই বড়ো, খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নয়। তাঁর হাতে তৈরি হয়েছেন বিদর্ভের অফস্পিনার অক্ষয় ওয়াখাড়ে। চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের উদ্যোগ ও ভোক্যালটনিকে উদ্বুদ্ধ হয়েছে অনেক অখ্যাত দল।

মধ্যপ্রদেশের ব্যাটসম্যান বেঙ্কটেশ আইয়ারকে দিয়ে ইনিংসের গোড়াপত্তন করিয়ে বেশ উপকার পেয়েছেন চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। এর জন্য বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠছেন বেঙ্কটেশ আইয়ার। মধ্যপ্রদেশের ব্যাটিং অর্ডারে শুভম শর্মাকে তিন নম্বর স্থানে তুলে এনেছেন চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান— যশ দুবেকে দিয়ে ইনিংসের গোড়াপত্তন করিয়ে বেশ বড়ো চমকের সৃষ্টি করেছেন চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। এর ফলে মধ্যপ্রদেশের ব্যাটিং বেশ জোরালো হয়েছে। রঞ্জি ট্রফিতে চারটি শতরান করেছেন শুভম। কেরলের বিরুদ্ধে ২৮৯ রানের একটি ঝকঝকে ইনিংস খেলেছেন যশ দুবে। রঞ্জি ট্রফিতে মুম্বাইয়ের বিরুদ্ধেও শতরান করেছেন দুবে।

অনেক সময়ে গভীর রাতেও খেলেয়োড়দের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। ইন্দোরে মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যেও মধ্যপ্রদেশের খেলেয়াড়দের তালিম দিয়েছেন তিনি। প্রবল শৃঙ্খলপরায়ণ ও সময়ানুবর্তী চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত খেলোয়াড়দের অতিমাত্রায় স্মার্ট ফোন, কম্পিউটার ও সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট ব্যবহার করা বন্ধ করে দিয়েছেন। খেলোয়াড়রা যাতে নির্দিষ্ট রুটিন মেনে অনুশীলন করেন, তার ওপর বেশিমাত্রায় জোর দিয়েছেন তিনি। তাঁর হাতেই তৈরি হয়েছেন ২০১৫ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে মুম্বাইয়ের অধিনায়ক আদিত্য তারে। ২০০১-০২ সালে মুম্বাইয়ের অনূর্ধ্ব ১৯ বছরের দলের কোচও হয়েছিলেন চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। এক সময়ে রঞ্জি ট্রফিতে মধ্যপ্রদেশের অধিনায়কত্বও করেছিলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ক্রিকেট খেলেছেন আন্তর্জাতিক স্তরে খ্যাতিপ্রাপ্ত নরেন্দ্র হিরওয়ানি, রাজেশ চৌহান, দেবেন্দ্র বুন্দেলা, জে.পি. যাদব ও অময় খুরেশিয়া। ২৩ বছর আগে মধ্যপ্রদেশের হয়ে খেলে ফাইনালে কর্ণাটকের বিরুদ্ধে হেরে যান চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতরা। সুতরাং কোচ হয়ে মধ্যপ্রদেশের দলটিকে রঞ্জি ফাইনালে জেতানো তাঁর ক্রীড়াজীবনকে যথেষ্ট উজ্জ্বলতা দিয়েছে। আইপিএল টুর্নামেন্টে কলকাতা নাইট রাইডারসের প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন তিনি— নিউজিল্যান্ডের ব্র্যান্ডন ম্যাককালামের জায়গায়। কে কে আর-এর প্রথম ভারতীয় কোচ তিনিই। □

সুন্দরবনে জাদুঘর গড়েছেন মৎস্যজীবী বিশ্বজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পথে যেতে যেতে পড়ে থাকা জিনিস কুড়োনোর স্বভাবটা ছিল ছোটোবেলা থেকেই। ভাঙা পোড়া মাটির পুতুল, পাথুরে অস্ত্র, টেরাকোটার কাজ এমনকী হাড়গোড় যা পেতেন কুড়িয়ে এনে তুলে রাখতেন কুলুঙ্গীতে। এর জন্য অবশ্য বাড়িতে কম বকুনি খেতে হয়নি। কিন্তু তাঁর এই অদ্ভুত খেয়ালের শখই এখন বহুমূল্য নিদর্শন হয়ে উঠেছে প্রত্ন বিজ্ঞানীদের কাছে। তিনি বিশ্বজিৎ সাহু। সুন্দরবনের গোবর্ধন দ্বীপের আর পাঁচটা সাধারণ বাড়ির মতোই তাঁর বাড়ি।

পেশায় মৎস্যজীবী বিশ্বজিতের বাড়ির চৌহদ্দিতে নানারকমের সবজির চাষ। বাড়ির আটপৌরে দেওয়ালে ক্ষুদিরাম, নেতাজী, ভগৎ সিংহ, যতীন দাশের ছবি। রয়েছেন রবিঠাকুর, নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্যও। আর আছে কাঠের পাটাতন দিয়ে তৈরি পরপর সাজানো তাক। সেখানে থরে থরে সাজানো হাড়গোড়, মাথার খুলি, নানা আকারের নানা ধরনের ভাঙা আসবাব পত্র। বৌদ্ধমূর্তি, মূর্তির অংশ, পোড়ামাটির গয়নার অবশেষ। বাড়ির ওই একচিলতে ঘরে একটি 'মিনি জাদুঘর' গড়ে তুলেছেন বিশ্বজিৎ। প্রায় ১৫ হাজার প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহ রয়েছে এখানে।

পড়াশোনা বেশিদূর এগোয়নি। সেই ১৬ বছর বয়স থেকেই সংসারের হাল ধরতে নদীতে মাছ ধরতে বেরোনো। মাছ ধরা পেশার সঙ্গে সঙ্গে আরও এক নেশা পেয়ে বসল বিশ্বজিৎকে। নৌকা নিয়ে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গভীরে জাল ফেলতে ফেলতে উঠে আসতো নদীগর্ভে পড়ে থাকা নানা ধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষ। বিশ্বজিৎ সেগুলো আবর্জনা বলে ফেলে দিতেন না। যত্ন করে বাড়িতে বয়ে আনতেন। আর জমিয়ে রাখতেন তার সাধের 'জাদুঘর'-এ। বলাবাহুল্য এইসব সংগ্রহের প্রাচীন ইতিহাস সন্ধান করা বা সেগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব খোঁজার তেমন আগ্রহ ছিল না বিশ্বজিতের। তবে এই সমস্ত সংগ্রহ থেকে অতীত ইতিহাসের নতুন দিগন্ত একদিন খুলে যাবে, তা তিনি জানতেন। তাঁর কথায় 'পড়াশোনা বেশিদূর করিনি। এই সমস্ত পুরনো জিনিস কুড়িয়ে এনে বাড়িতে রেখে দিতাম ছোটো থেকেই। ক্লাস থ্রি'র ইতিহাস বইয়ে পড়েছিলাম পুরনো জিনিস থেকেই পুরনো দিনের ইতিহাস জানা যায়। তই সেগুলো যত্ন করে রেখেছি।'

বিশ্বজিৎ সাহুর প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহের কথা লোকমুখে প্রচারিত হতে হতে একদিন তা পৌঁছালো ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্মকর্তাদের কানে। সেই সময় পাথরপ্রতিমা দ্বীপে খনন চলছে। নেতৃত্বে রয়েছেন ফণীকান্ত মিশ্র। তিনি গোবর্ধনপুর দ্বীপে গিয়ে বিশ্বজিতের সংগ্রহ দেখে অবাক হলেন। গোটা একটা বিলুপ্ত সভ্যতার ইতিহাস সাজিয়ে রেখেছেন বিশ্বজিৎ এই বাদাবনের নির্জন এলাকায়। ফণীকান্ত মিশ্র বলেন, 'সাহু পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে কিছু জানেন না, মৌর্যযুগ সম্পর্কেও তাঁর কোনও ধারণা নেই। তবু ব্যক্তিগত আগ্রহেই সেই সভ্যতার প্রত্ননিদর্শনগুলো নষ্ট না করে যত্ন করে নিজের কাছে রেখেছেন।'

ফণীকান্ত মিশ্রর মতে, এই সমস্ত প্রত্ননিদর্শন থেকে অনুমান করাই যায়, সুন্দরবনের এই সভ্যতা মৌর্যযুগে শুরু হয়ে শুঙ্গযুগ পেরিয়ে গুপ্তযুগে শেষ হয়। দিন আনা, দিন খাওয়া সংসারে মাছ ধরতে না বেরোলে সেদিন হয়তো অন্নই জুটবে না। অথচ, জলমগ্ন বনের ধারালো প্রান্ত সাগরে, গোলপাতায় ঘেরা বনের আশেপাশে ও ভেতরে নৌকায় ভেসে ভেসে মাছ ধরার সময় তার নজর আরও অন্য কিছু খোঁজে। কোনওদিন প্রাচীনত্বের বহুমূল্য সম্পদগুলোর খোঁজ করতে গিয়ে মাছ ধরার কথাই বেমালুম ভুলে গেছেন বিশ্বজিৎ। সেদিন রোজগারের ভাঁড়ে মা ভবানী দশা। বাড়িতে অশান্তি। তবু সংগ্রহের নেশা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি মাঝবয়েসি এই মৎস্যজীবী। এ হলো তার ভালো লাগা ও নেশা।

বিশ্বজিতের এই অমূল্য সংগ্রহ এখন এদেশের পুরাতত্ত্ব বিভাগের সম্পদ। গুপ্তযুগের (৩২০-৫৪০ খ্রি:), মৌর্যযুগ (খ্রি:-পূ: ৩২১-১৮৫) এবং শুঙ্গ (খ্রি:-পূ: ১৮৫-৭৩) রাজত্বের সময়কালের নানা শিল্প নিদর্শন, হাড়গোড়, মাথার খুলি নিজের সংগ্রহশালায় সাজিয়ে রেখেছেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী ও প্রাচীন শহর কলকাতা এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে খননকাজের সঙ্গে তুলনা করলে বিশ্বজিৎ সাহুর এই নিদর্শনগুলির গুরুত্ব অমূল্য। বর্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিকদের মতে, তাঁদের জানা ইতিহাসেরও অনেক আগে এই অঞ্চলের ইতিহাসের আলোচনা শুরু করতে হচ্ছে সাহুর আবিষ্কারের মাধ্যমে। ভারতের সেন্টার ফর আর্কিওলজিক্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড ট্রেনিঙের ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার ফেলো শর্মী চক্রবর্তী বিশ্বজিতের এই চেষ্টার প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, সাহুর কাজ আমাদের জানায়, সুন্দরবনের মানবজাতির ইতিহাস খ্রিস্টজন্মের ১ অথবা ২ শতাব্দী আগে থেকে। এছাড়াও আরও ইতিহাস আছে যা এখনোও গভীর বনজঙ্গলে চাপা পড়েছে।'

বিশ্বজিৎ সাহু কোনওদিন ভাবেননি, যেসব জিনিস কুড়োনোর জন্য পাড়াপড়শি এমনকী বাড়ির লোকও গঞ্জনা দিয়েছে, সেগুলোই একদিন কথা বলবে। দেবে প্রাচীন ইতিহাসের খোঁজ। তার সেই ছোটো জাদুঘরে এখন প্রতিদিনই ইতিহাসবেত্তা ও পণ্ডিতদের আনাগোনা। এসব দেখে আঁচলে চোখ মোছেন তাঁর স্ত্রী। ভাবেন এবার হয়তো দিন ফিরবে মানুষটার। □

সি ভি রমণ

কলকাতার সদাব্যস্ত বউবাজার স্ট্রিটের ২১০ নম্বর বাড়ি। সেখান তখন 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অব সায়েন্স'-এর মুখ্য কার্যালয় ছিল। এরই একটি গবেষণাগারে ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসের সন্ধ্যায় চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরমণ তাঁর কয়েকটা যন্ত্রের প্রয়োগ দেখাচ্ছিলেন। এমন সময় কে এস কৃষ্ণন নামে এক যুবক উত্তেজিত ভাবে এসে জানালেন প্রফেসর কম্‌টন নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। এই খবরে রমণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন, ' যদি কম্‌টন প্রভাব রঞ্জনরশ্মির ক্ষেত্রে সঠিক হয়, তাহলে আলোর ক্ষেত্রেও হবে।'

কয়েকবছর আগে এ এইচ কম্‌টন পরীক্ষা করে দেখেন যে রঞ্জনরশ্মি যখন কোনো বস্তুর মধ্যে দিয়ে যায়, তখন তার কিছু স্বভাবগত পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন নির্ভর করে সেই বস্তুর মৌলিক গুণের উপর। ওই প্রভাবকে কম্‌টন প্রভাব বলা হয়।

রমণের মনে প্রশ্ন জাগলো, স্বচ্ছ বস্তুর মধ্যে দিয়ে যখন আলো যায়, তখন আলোরও কি এমন পরিবর্তন হয়? সুদীর্ঘ পাঁচবছর ধরে আলোকবিদ্যার উপরে তিনি গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর উচ্চমানের কোনো যন্ত্র ছিল না। তাসত্ত্বেও তিনি দৃঢ়নিশ্চয় ছিলেন যে এই যন্ত্রপাতির কিছু উন্নতি করেই তিনি এই প্রশ্নের সামাধান বের করতে পারবেন।

ঠিক চারমাস পরে ১৯২৮ সালের ১৬ মার্চ ব্যাঙ্গালোরের এক বৈজ্ঞানিক সভায় রমণ তাঁর নতুন বিকিরণের আষ্কিারের কথা ঘোষণা করলেন। তাঁর এই আবিষ্কারকেই 'রমণ প্রভাব বা 'রমণ এফেক্ট' বলে স্বীকৃতি দিল সারা বিশ্ব। মাত্র দুশো টাকা দামের অতি সাধারণ যন্ত্র দিয়ে তিনি এমন একটা আবিষ্কার করলেন যা তাঁকে ১৯৩০ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল প্রাইজ এনে দিল। আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে এই দিনটি চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বিলেতে থেকে ফেরার পথে জাহাজের ডেকে বসে নীল আকাশ ও নীল

সমুদ্র দেখতে দেখতে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল, এই আকাশ ও সমুদ্র নীল কেন? এই বিষয়ে চিন্তা করতে করতে তাঁর ধারণা হলো যে জলের কণার দ্বারা আলোর বিচ্ছুরণের ফলে নিশ্চয় এই নীল রং দেখা যায়। কিন্তু তাঁর এই ধারণা তো পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত করা দরকার। কলকাতায় ফিরে তিনি বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে তার উপর গবেষণা শুরু করে দিলেন এবং এর থেকেই পরে তিনি বিশ্ববিখ্যাত হন।

১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ৭ নভেম্বর তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লীতে রমণের জন্ম হয়। তাঁর বাবা একটি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। ছোটোবেলা থেকেই রমণ অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। ম্যাট্রিক পাশ করার পর বাবা-মা তাঁকে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু একজন ইংরেজ চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁরা রমণকে বিদেশে না পাঠিয়ে মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজে এমএ ক্লাসে ভর্তি করে দিলেন।

ছোটোবেলা থেকেই বিজ্ঞান রমণকে আকর্ষণ করত। বিভিন্ন নামকরা বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় গবেষণামূলক রচনা লিখতে শুরু করেন। মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অব সায়েন্স-এর সদস্য হন। ইতিমধ্যে বাবা-মার ইচ্ছানুসারে তিনি কলকাতায় অর্থ মন্ত্রালয়ে একটি প্রশাসনিক চাকরি গ্রহণ করেন। কিন্তু বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ বিন্দুমাত্র কমল না। এই সময়ে তিনি দপ্তর থেকে ফিরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমনকী কখনও সারা রাত গবেষণাগারে কাজ করতেন।

যৌবনে রমণের ধ্বনিবিজ্ঞানের প্রতি খুব আকর্ষণ ছিল। তিনি বেহালার মতো ছড়ওয়ালা এবং সেতারের মতো তারযন্ত্র থেকে কী করে সুসমঞ্জস সংগীত সৃষ্টি হয় সে বিষয়ে অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা করেছিলেন। তিনি এবিষয়ে এত গভীরভাবে একাত্ম হয়েছিলেন যে ১৯২১ সালে লন্ডনে ধ্বনিবিজ্ঞানের উপর বক্তৃতা দেবার পর শ্রোতাদের মধ্যে এক বৈজ্ঞানিক কৌতুক করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি কি বেহালা বাজিয়ে রয়্যাল সোসাইটির সদস্য হতে চান?

১৯২৪ সালে রমণ আলোকবিদ্যায় তাঁর বিশেষ অবদানের জন্য রয়্যাল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। এর ছয় বছর পরে তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়ে বিশ্বজোড়া খ্যাতি পান। কঠিন,তরল অথবা বায়বীয় স্বচ্ছ বস্তুর মধ্যে দিয়ে যখন আলো যায় তখন সেই আলোর মধ্যে কিছু প্রকৃতিগত পরিবর্তন দেখা যায়। একেই রমণ এফেক্ট বলে। স্ট্রাইকার যেমন ক্যারাম বোর্ডের ঘুঁটিগুলিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়, সেই রকম মাধ্যমের পরমাণুগুলি আলোককণাগুলিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়। রমণ এফেক্ট আবিষ্কারের এক দশকের মধ্যে প্রায় দু'হাজার রাসায়নিক যৌগের অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে নির্ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়েছে।

১৯৪৩ সালে তিনি ব্যাঙ্গালোরের কাছে রমণ গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করেন। সুন্দর বাগানের মধ্যে প্রাসাদোপম এই বাড়িতে ১৯৭০ সালের ২০ নভেম্বর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি গবেষণা চালিয়ে যান। রমণ কোনোদিনই ধ্বনিবিজ্ঞানে উৎসাহ হারাননি। মৃদঙ্গম ও তবলায় সুসমঞ্জস ধ্বনিসাদৃস্য আছে এবং এবিষয়ে এদুটি যন্ত্র অন্যান্য ঢোলক জাতীয় যন্ত্র থেকে পৃথক---এটিও তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার।

দিলীপ এম সালভি

ভারতের বিপ্লবী

সঞ্জীবচন্দ্র রায়

বিপ্লবী সঞ্জীবচন্দ্র রায়ের জন্ম ১৮৮৮ সালে পূর্ববঙ্গের কিশোরগঞ্জ জেলার কায়স্থ পল্লীতে। তিনি ছোটোবেলায় বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ময়মনসিংহ যুগান্তর দলের কর্মী ছিলেন। কিশোরগঞ্জ মহকুমায় বৈপ্লবিক সংগঠন কার্যের পুরোধা ছিলেন। পুলিশের নজর এড়িয়ে বৈপ্লবিক কাজকর্ম পরিচালনা করতেন। ১৯১৬ সালে গোপনে থাকাকালীন পুলিশ তাঁকে বাড়িতে না পেয়ে অনুসন্ধান চালায় এবং শহর থেকে দূরে রিভলভার ও গুলি-সহ গ্রেপ্তার করে। ১৯১৬ সালের ১৩ জুলাই বিচারে তাঁর দু' বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কারাগারে প্রচণ্ড নির্যাতনের ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

জানো কি?

- সারেঙ্গিতে ১১টি পেতলের তার থাকে।
- তানপুরায় ৪টি তার থাকে।
- হারমোনিয়ামে গান গাওয়ার আকারমাত্রিক স্বরলিপির বাংলা বই প্রথম লেখেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- জাইলোফোন হলো কাঠের তৈরি বাদ্যযন্ত্র।
- নাগাস্বরম্ হলো দক্ষিণ ভারতের যন্ত্রসংগীত।
- হিন্দি টপ্পাগানের তাল ও ভাব অক্ষুণ্ণ রেখে বাংলা টপ্পা গান জনপ্রিয় হয় রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে।

ভালো কথা

নো প্লাস্টিক

এবার স্বাধীনতা দিবসের দিন সকালে আমরা জাতীয় পতাকা আর 'নো প্লাস্টিক' লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে বাজারে এসে জমা হলাম। তাপর জাতীয় সংগীত গাওয়ার পরে বাজারের মধ্যে দোকানে দোকানে ঘুরে ঘুরে বাজার করতে আসা লোকজনদের প্লাস্টিক না নিতে অনুরোধ করতে লাগলাম। একটু পরে ক্লাবের দাদারাও এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। যারা বাজার করতে ব্যাগ আনেননি তাদের পাঁচটাকার বিনিময়ে একটা কাপড়ের ব্যাগ ধরিয়ে দিয়ে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ না নিতে অনুরোধ করতে লাগলেন। তিনঘণ্টা আমরা এই অভিযান চালিয়েছি। শেষে আমরাও প্লাস্টিক ব্যবহার না করার প্রতিজ্ঞা করে বাড়ি ফিরে এলাম ।

শিবানী সিংহ, সপ্তম শ্রেণী, ঝালদা বাজার, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

পূজার মজা

পৌলমী সেন, দ্বাদশ শ্রেণী, মানবাজার, পুরুলিয়া।

মণ্ডপেতে ঠাকুর গড়ার কাজ হয়েছে শুরু
বুকের মধ্যে পুজোর বাদ্যি বাজছে গুরু গুরু।
দিঘির জলে পদ্ম শালুক, পাড়ে কাশের দোল
বাদ্যিপাড়ায় সানাই প্যাঁপোঁ, দিচ্ছে ঢাকের বোল।
সান্তালপাড়ায় বাজছে মাদল তাধিন তাধিন ধিন
সাঁঝবেলাতে তারই সাথে সুর ধরেছে বিন।
ভাইটি আমার বেজায় খুশি পাবে নতুন জামা
বাবা দেবে কাকাই দেবে আর দেবে মামা।
আমার মনটিও বেজায় খুশি আসছে রে ভাই পূজা
পড়তে বসার শাসন বন্ধ, কেবল মজাই মজা।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

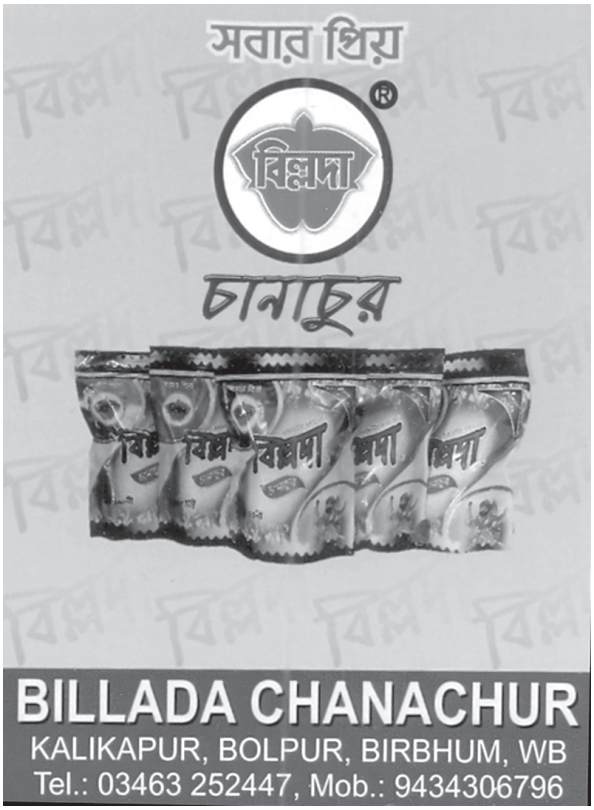

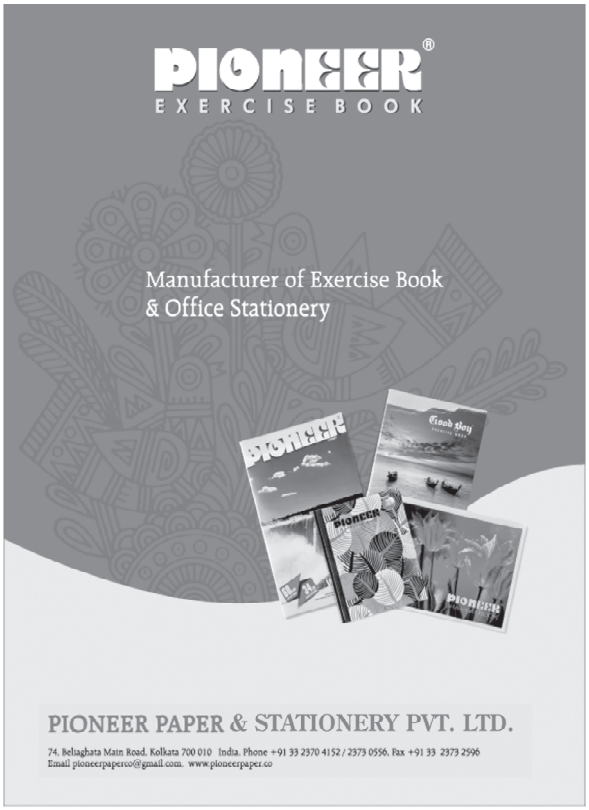

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

বিনা রক্তপাতে বিশ্বজয়ের কাহিনি

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

নরেনদের বাড়িতে সেদিন আনন্দের বন্যা। প্রায় চার বছর পর তার দাদু ও ঠাকুমা এ বাড়িতে এসেছেন। দাদুরা থাকেন কলকাতার মানিকতলায় ছোটোকাকুর কাছে। নরেনের বাবারা দুই ভাই, দুই বোন। পিসিদেরও সব কলকাতায় বিয়ে হয়েছে। কিন্তু তার বাবা চাকুরি সূত্রে বহু বছর ধরে রামেশ্বরমে আছেন। নরেন ও তার বোন গৌরীর জন্ম এখানেই। তার বাবা পরিবারের সকলকে নিয়ে বছরে অন্তত একবার কলকাতার বাড়িতে ১০/১৫ দিন কাটিয়ে আসেন। কিন্তু গত ক'বছর করোনার প্রকোপ, তারপর অফিসের চাপ সব মিলিয়ে প্রায় তিন বছর তাদের আর কলকাতার বাড়ি যাওয়া হয়ে ওঠেনি। নরেনরা শেষ যেবার গিয়েছিল তখন সে সবে ফাইভে উঠেছে। এখন ক্লাস এইট। এত বছর পর দাদু ঠাকুমাকে কাছে পেয়ে আনন্দে সে আত্মহারা। ছোটো বোন গৌরীও ক'দিন ঠাকুমার আঁচল ছাড়ছে না।

কাল ওরা সকলে মিলে গিয়েছিল কন্যাকুমারী রক মেমোরিয়াল দেখতে। এত কাছে থেকেও নরেনের এখনো পর্যন্ত সমুদ্রে ঘেরা পাথরের দ্বীপের এই স্মৃতিমন্দির দেখা হয়নি। শিবনাথবাবু স্বামী বিবেকানন্দের স্ট্যাচু দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন— বলতো ইনি কে? নরেন আর গৌরী সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠেছিল— স্বামী বিবেকানন্দ। দাদু বললেন— 'কারেক্ট। এবার বলো এঁর বাড়ি কোথায়?' নরেন জানতোই, বলল— কোথায় আবার, শিমুলিয়ায়। আমাদের কলকাতার বাড়ির কাছে। শিবনাথবাবুর মুখে সন্তোষের হাসি, বললেন— 'ঠিক। শেষ যেবার তোমরা বাড়ি গেলে তখন তোমাদের স্বামীজীর বাড়ি ঘুরিয়ে এনেছিলাম, মনে আছে দেখছি। এবার একটা কঠিন প্রশ্ন দেখি বলতে পারো কিনা— কলকাতার শিমুলিয়ার এক বাঙ্গালি যুবকের মূর্তি এই সুদূর তামিলনাড়ুতে কেন? তিনি এমন কী করেছিলেন? নরেন বলে— কেন আবার, সন্ন্যাসী বলে! দাদু মাথা নেড়ে বলেন— হলো না! এ দেশে কত হাজার হাজার সন্ন্যাসী, শুধু এই তামিলনাড়ু রাজ্যেই কত সাধু-সন্ত-মহাত্মার ছড়াছাড়ি— তাদের মূর্তি না বসিয়ে এই বাঙ্গালি সন্ন্যাসীর মূর্তিই-বা এখানে বসানো হলো কেন?' নরেন এবার হোঁচট খায়, বলে— এটা বলতে পারব না। তুমিই বল, কেন? দাদু বলেন— এখন শুনতে গেলে এসব দেখবে কখন? এখন ভালো করে ঘুরে ফিরে দেখে নাও, বাড়ি ফিরে শুনবে। শুধু এটুকু শুনে রাখো এই রক মেমোরিয়াল স্বামীজীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে তৈরি হয়েছিল। আর এর যিনি প্রধান স্থপতি তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ নামে এক ভুবন বিখ্যাত সামাজিক সংগঠনের কুশল প্রচারক নাম একনাথ রানাডে। পাথরের ফলকে সব লেখা আছে। ভালো করে দেখে নাও, বাকিটা বাড়ি ফিরে শুনবে।

নরেন স্মারক মন্দিরের চারিদিক ঘুরে ফিরে দেখল। সব যে বুঝল তা নয়, তবে তার মনে হলো স্বামীজী নিশ্চয়ই এই শিলাখণ্ডে এমন কিছু একটা করেছিলেন যাতে এখানকার সব কিছুই বিবেকানন্দময় হয়ে আছে। যতটা বুঝল ততটা মনে গেঁথে রাখল, যেটা বুঝল না দাদুর উত্তরের অপেক্ষায় রইল।

সেদিন বাড়ি ফিরে নরেন এত ক্লান্ত ছিল দাদুর কাছে কিছুই শোনা হলো না। রাত্রি ৯টা বাজতে না বাজতেই দু'চোখে ঘুম নেমে এল। পরদিন শিবনাথবাবু প্রাতর্ভ্রমণ থেকে ফিরে দেখেন নরেনের সব কাজ শেষ। শিবনাথবাবুকে দেখেই নরেন দাদুকে জড়িয়ে ধরল, বলল— দাদু কাল কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তরগুলো দাওনি। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে এসো। আজ রবিবার, স্কুল নেই, সকাল সকাল চা খেয়ে গল্পটা শুরু করে দাও। দাদু বলেন— সে তো বলবই, কিন্তু আজ কি বিশেষ দিন জানো তো? নরেন একটু মাথা চুলকে বলে— ঠিক মনে পড়ছে না তো!

দাদু বলেন— আজ ১১ সেপ্টেম্বর। নরেন বলে— ১১ সেপ্টেম্বর। এই দিন বিখ্যাত কেন? মুচকি হেসে দাদু বলেন— এটা এখন সাসপেন্স রইল। সকালে এক ঘণ্টা হেঁটে পেটে ছুঁচো ডন মারছে। আগে সকলে মিলে জলখাবার খেয়ে নিই, তারপর তোমার মা, বাবা, বোন, ঠাকুমা সবাইকে নিয়ে আজকের দিনের এক 'বিশেষ গল্প' শুনবো। এক বীর

সেনাপতির গল্প। নরেন বলে— ও আজ বুঝি কোন বীর যোদ্ধার জন্মদিন? দাদু বলেন— না, হলো না। নরেন বলে— তবে নিশ্চয়ই কোনো বড়ো যুদ্ধ জয়ের দিন? শিবনাথবাবু মুচকি হেসে বলেন— উত্তরটা ঠিক, কিন্তু তুমি যে কথা ভেবে উত্তরটা দিয়েছো, সম্ভবত সেটা ভুল। যুদ্ধই বটে, তবে সে যুদ্ধে সৈন্যসামন্ত হাতি-ঘোড়া অস্ত্র-রক্তপাত এসব কিছু নেই। আছে হাজার বছর ঘুমিয়ে থাকা এক জাতির এক বীর পুরুষের নিজের দেশ ও ধর্মকে জাগিয়ে তুলে তাকে বিজয়ী করার এক রোমহর্ষক কাহিনি। দাদুর কথা শুনে নরেনের কেমন যেন অ্যাডভেঞ্চারের মতো মনে হলো। সে বলে— বলো না দাদু কেমন যুদ্ধ, কোন সেনাপতির কথা বলছ?' দাদু বলেন— একটু রহস্য থাক না। জলখাবারের শেষেই না হয় শুনবে। এখন যাও মাকে তাড়াতাড়ি জলখাবার দিতে বলো। বলো দাদুর খুব খিদে পেয়েছে। নরেনের অভিমান হলো। বলল— তোমার সব ভালো, শুধু এটাই খারাপ। আমাকে খালি সাসপেন্সে রাখো। শিবনাথবাবু নাতির কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন।

ঘড়ির কাঁটায় সকাল ৯টা। জলখাবার সেরে সকলে এসে জুটেছেন ড্রইংরুমে। নরেনের বাবা মা খাটে। একপাশে সোফায় ঠাকুমার কোলে গৌরী। আর ঠিক বিপরীতে সোফায় বসে দাদু। নীচে কার্পেটে দাদুর দিকে মুখ করে বসে নরেন। সে বলে— দাদু, এবার বলো আজ কোন যুদ্ধের দিন? কে ছিল সেই যুদ্ধের সেনাপতি?

শিবনাথবাবু শুরু করলেন— 'আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ। কিন্তু আজ আমরা স্কুলে, কলেজে, মানচিত্রে যে ভারতকে দেখি আগে এরকম ছিল না। তখন ছিল সম্পূর্ণ আলাদা ভারত।' নরেন বলে— আলাদা ভারত, কীরকম? শিবনাথবাবু বলেন— আজ যে ভারত দেখছো সেটি ছোট্ট ভারত, ভাঙাচোরা ভারত, খণ্ডিত ভারত, মাত্র ৩২ লক্ষ বর্গকিলোমিটারের দেশ। কিন্তু আগে এই ভারত ছিল বিশাল, ৮০ লক্ষ বর্গকিলোমিটারের। যেখানে ছিল গান্ধার রাজ্য, যার বর্তমান নাম আফগানিস্থান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ছিল শিব-পার্বতীর বিচরণ ও সাধন ভূমি তিব্বত। ছিল ব্রহ্মদেশ— যা বর্তমানে মায়ানমার, ছিল সিংহল বা শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান আরও কত ছোটো ছোটো রাজ্য— এসব নিয়েই ছিল বিশাল ভারতবর্ষ।

নরেন বলে— ওরে ব্বাবা, এত বড়ো? শিবনাথবাবু বলেন— শুধু তাই? পৃথিবীর এই একমাত্র দেশ যেখানে স্বয়ং ভগবান মানুষের বেশ ধরে কখনও শ্রীরামচন্দ্র, কখনও-বা শ্রীকৃষ্ণ রূপে জন্ম নিয়েছেন। বুদ্ধ, মহাবীর, শঙ্করাচার্য, নানকদেব, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি কত সন্ত-মহাত্মারা এদেশে লোকশিক্ষা দিয়েছেন। আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ভাই লক্ষ্মণকে বোঝাবার সময় একটা ভারতের কথা বলেছেন— সেটা কোন ভারত? 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরিয়সী' অর্থাৎ স্বর্গের চাইতেও যে দেশ বড়ো তার নাম— জন্মভূমি ভারতবর্ষ। রামের পরে কৃষ্ণ। কৃষ্ণও বলেছেন এই ভারতের কথা— 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত...'। একদম আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে এ ভারত কেমন ভারত? 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী মা'— ভারত। এরপর বঙ্কিমচন্দ্র, তিনি বন্দেমাতরম্ গানে লিখেছেন মায়ের রূপ— ত্বং 'হি দুর্গা দশপ্রহরণ ধারিণী, কমলা কমলদল বিহারিণী, বাণী বিদ্যাদায়িনী, নমামি তাং'। অর্থাৎ এই ভারত স্বয়ং মা দুর্গা, মা-লক্ষ্মী, মা-সরস্বতী'। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, তাঁর ভারত কেমন ভারত? ---'সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি।' অর্থাৎ সকল দেশের সেরা ভারত। কবি অতুল প্রসাদ সেনের ভারত কেমন ভারত? 'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে'— অর্থাৎ এ দেশ এক সময় জগতে শ্রেষ্ঠ ছিল, আগামীদিনে আবার শ্রেষ্ঠ হবে। এবার ঋষি অরবিন্দ, তাঁর চোখে এ ভারত কেমন? তাঁর কাথায়— 'সকলে এ দেশকে ইট, কাঠ, মাটি, পাথরের সমষ্টি বলিয়া জানে, কিন্তু আমি এ দেশকে মা বলিয়া জানি, পূজা করি। এ হলো মৃন্ময়ী আধারে চিন্ময়ী সত্তা।'

এসব শুনে নরেন বলে ওঠে— দাদু তুমি সবার নামই তো নিলে কিন্তু স্বামীজী ভারত সম্বন্ধে কী বলেছেন সেতো বললে না? শিবনাথবাবু বলেন— আজ তাঁর কথা বলার জন্যই তো সকলকে ডাকলাম। এতক্ষণ যেটা বললাম সেটা ভূমিকা। আমি তো আগেই বলেছি এই দেশ সব চাইতে বড়ো ছিল, সকল দেশের সেরা ছিল। কিন্তু কী কারণে হঠাৎ সেই বিশ্বসেরা দেশটা, ফাস্ট বয়টা লাস্ট বয় হয়ে গেল স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম এর কারণ অনুসন্ধান করেছিলেন। বিদেশি দস্যুর দল পাঠান মোগল থেকে শুরু করে ইংরেজ রাজত্ব পর্যন্ত এই যে প্রায় এক হাজার বছর ভারত পরাধীন ছিল— এই সময়েই এদের চক্রান্তেই আমাদের এত বড়ো দেশ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে।

দাদুর কথা শুনে নরেন তো অবাক, বলে— সে কী দাদু ইংরেজরা বিদেশি এটা সত্যি কিন্তু পাঠান মোগল এরা বিদেশি কী করে? আমাদের ইতিহাসে যে পড়ানো হয় মুসলমান বাদশারা এদেশেরই মানুষ, ভালো রাজা ছিল, তাছাড়া তাদের বংশ মনে রাখতে আমাদের মুখস্থ করানো হয়— 'বাবার হইল আবার জ্বর সারিল ঔষধে'— এসব কি তবে মিথ্যা?

শিবনাথবাবু বলেন— যে যুগে এদেশে ৫০ হাজারেরও বেশি মঠ-মন্দির- বিহার-তীর্থক্ষেত্র ভাঙা হয়েছে, নালন্দা, তক্ষশীলার মতো পৃথিবী বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করা হয়েছে। যাদের শাসনে হিন্দু মেয়েদের হারেমে বন্দি রেখে প্রতিদিন তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করা হয়েছে, হিন্দু মেয়েদের বেচা-কেনার জন্য মিনাবাজার বসানো হয়েছে। যুদ্ধে হিন্দু রাজারা পরাজিত ও নিহত হলে রানি-সহ হাজারে হাজারে হিন্দু রমণী যে যুগে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে জহরব্রত পালন করেছে। যাদের রাজত্বে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে করতে বান্দা বৈরাগী, শিবাজী, শাজী, রানা প্রতাপ, দুর্গাবতীরা নিদরুণ নির্যাতন সহ্য করে মৃত্যুবরণ করেছে। যাদের রাজত্বকালে আমাদের পূর্বপুরুষেরা কেবল হিন্দু হয়ে বেঁচে থাকার জন্য প্রজন্মের পর প্রজন্ম অপমানজনক জিজিয়া কর দিতে বাধ্য হয়েছে সেই পাঠান মোগলের যুগ আমাদের কাছে স্বাধীনতার যুগ ছিল? আরও বড়ো কথা এই হাজার বছরের মধ্যেই তো আমাদের দেশ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়েছে— এখন বলো, যারা এদেশকে ভেঙে খণ্ড বিখণ্ড করল তারা কি এই দেশ মায়ের ছেলে? ছেলে কি কখনও মায়ের হাত, পা, গলা, মাথা কেটে খণ্ড খণ্ড করতে পারে?' নরেন চেঁচিয়ে উঠল— 'কখনই না।' শিবনাথবাবু বললেন— তাই এটা মনে

বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনের মঞ্চাসনে স্বামী বিবেকানন্দ।

রেখো এদেশে ইংরেজ শাসনে যতটা পরাধীন ছিলাম, ওই পাঠান-মোগল শাসনে আমরা ততটাই পরাধীন ছিলাম। এই সবটা ধরলে আমাদের দেশ প্রায় এক হাজার বছর পরাধীন ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ পরাধীন ভারতের প্রায় শেষের দিকে ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি আমাদের মাঝে এসেছিলেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রথম সকল দেশের সেরা ভারতবর্ষ কীভাবে ভিখারিণী হয়ে গেল তার কারণ পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করে তার পরিত্রাণের পথও বলে দিয়েছিলেন। যার প্রদর্শিত পথে আমরা ১৯৪৭ সালে এদেশের খণ্ডিত স্বাধীনতা পেলাম।

নরেন বলে— কিন্তু স্বামীজী কীভাবে একাজ করলেন তার কিছু কথা তো বলো। শিবনাথবাবু আবার শুরু করেন— ১৮৮৬ সালের ১৬ আগস্ট কাশীপুর উদ্যানবাটীতে গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বর্গবাস হলো। স্বামীজী আর তাঁর গুরুভাইয়েরা তৈরি করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ। তারপর তাদের হাতে মঠ পরিচালনার ভার দিয়ে স্বামীজী ১৮৯০ সালের ৩১ মে ন্যাড়া মাথায়, গেরুয়া পরে, লাঠি হাতে, খালি পায়ে বেরিয়ে পড়লেন দেশকে জানতে— 'পরিব্রাজক বিবেকানন্দ'। তিন বছর কেবল পায়ে হেঁটে পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর হয়ে এসে পৌঁছলেন দক্ষিণে, তামিলনাড়ুতে। ১৮৯২ সালের ২৪ জানুয়ারি কুমির হাঙর শঙ্কুল অশান্ত হিন্দুমহাসাগর সাঁতরে উঠলেন ভারতের শেষ শিলাখণ্ড কন্যাকুমারিকাতে। তারপর ২৫, ২৬, ২৭ ডিসেম্বর সেই শিলাখণ্ডে বসে তিনদিন তিনরাত ধ্যানে মগ্ন থাকলেন তিনি। বলতো কার ধ্যান? ভগবানের? না, —মাতৃভূমি ভারতবর্ষের ধ্যান। ২৭ ডিসেম্বর সিদ্ধি লাভ হলো তাঁর। তিনি দিব্যচক্ষে দেখতে পেলেন ভারতের অতীত গৌরব, বর্তমানে দুর্দশা ও তার কারণ এবং ভবিষ্যৎ ভারতের উজ্জ্বলতর রূপ এবং তা প্রাপ্তির পথ। বুঝলেন ভারতের প্রাণশক্তি রয়েছে ধর্মে, সেই ধর্মকে ঠিক ঠিক জাগাতে হবে। তিনি বললেন, 'আমি যেন দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি আমাদের সেই প্রাচীনা জননী আবার জাগিয়া উঠিয়া পুনর্বার নবযৌবনসম্পন্না এবং পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে মহিমান্বিতা হইয়া তাঁহার রত্ন সিংহাসনে বসিয়াছেন, বিশ্বকে বরাভয় দান করিতেছেন। ...এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।'

কন্যাকুমারীতে সিদ্ধিলাভ শেষে তিনি এলেন মাদ্রাজে। শুনলেন পরের বছর আমেরিকার বিশ্বধর্ম মহাসভার কথা। একদিকে পৃথিবীর কাছে ভারতবর্ষ ও তার প্রাণভোমরা হিন্দুধর্মকে উপস্থাপিত করার প্রবল ইচ্ছা, অন্যদিকে কীভাবে যাবেন, অর্থই-বা কে দেবে— এই চিন্তাই তাঁকে গ্রাস করল। একদিন রাতে স্বপ্ন দেখলেন— গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সমুদ্র পেরিয়ে বিদেশে পাড়ি দেওয়ার ইঙ্গিত করছেন। বুঝলেন গুরু যখন চাইছেন, ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে। স্বামীজীর ইচ্ছার কথা শুনে মাদ্রাজের যুবকেরা বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে অর্থ সংগ্রহ করলো। খেতড়ির রাজাও করলেন সাহায্য।

তারপর নরেনের বিস্মিত প্রশ্ন--- বিবেকানন্দ সত্যিই আমেরিকা পাড়ি দিলেন?

'নিশ্চয়ই। গুরুর স্বপ্নাদেশ কি মিথ্যা হতে পারে? অবশেষে ১৮৯৩ সালের ৩১ মে তিনি পেনিনসুলার জাহাজে চেপে রওনা দিলেন চিকাগোর উদ্দেশে। কিন্তু ধর্মসভায় অংশগ্রহণের জন্য আগে থেকে যে অনুমতিপত্র লাগে— তা তো তাঁর ছিল না। তাই সেখানে গিয়ে অকূলপাথারে পড়লেন। ঈশ্বরের ইচ্ছার সে বাধাও কাটল। পরিচয় হলো হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক হেনরি রাইট এবং জর্জ ডবলিউ হেল নামে এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে। তাঁদের চেষ্টায় অবশেষে মিলল অনুমতি, তবে প্রথম দিনের অধিবেশনের শেষে পাঁচ মিনিট কিছু বলার সুযোগ, ব্যাস ওটুকুই।

নরেন— সেকী দাদু, এত কষ্ট করে গিয়ে শেষে মাত্র ৫ মিনিট বলার সুযোগ?

'পুরোটা তো শোন। ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, আজকের সেইদিন, উত্তর আমেরিকার চিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউটের কলম্বাস হলে বিকাল ৪টায় সারা পৃথিবীর সব চাইতে বুদ্ধিমান জ্ঞানী-গুণী সাত হাজার মানুষের সামনে পৃথিবীর সবচেয়ে ছোটো

কিন্তু সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ, মাত্র ৩ মিনিট ৩৯ সেকেন্ডের এক কালজয়ী ভাষণে স্বামীজী বিশ্বকে বোঝালেন ভারতবর্ষ কী, হিন্দুধর্ম কী? আমাদের জাতি কী? পৃথিবী কী? সেই পৃথিবীতে ভারতের ভূমিকা কী।

নরেন বলে— মাত্র ৩ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড! এইটুকু সময়ে তিনি এত কথা বলে ফেললেন? শিবনাথবাবু বলেন--- স্বামীজী বলেই পারলেন। আসলে কী জানো এই বিশ্বধর্মসভা খ্রিস্টানরাই আয়োজন করেছিল, কিন্তু কেন এর সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন অন্য এক প্রবীণ সন্ন্যাসী। শোন, তিনি লিখেছেন--- শিবনাথবাবু একটা ছোট্ট চটি বই থেকে পড়তে শুরু করলেন— 'এই সভার আয়োজকরা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে এই ধর্মসভায় খ্রিস্টধর্মেরই বিজয় পতাকা সর্বোপরি উড্ডীন হইবে এবং অন্যান্য ধর্মের অসারতা চিরকালের জন্য প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে। হিন্দুধর্ম একপ্রকার অন্তঃসারশূন্য— ইহা তাহারা একপ্রকার স্থির নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কে জানিত যে ত্রিংশতবর্ষীয় (স্বমীজীর তখন ৩০ বছর বয়স), কপর্দকশূন্য, ভিক্ষাজীবী এক যুবা পরিব্রাজক এই পরাধীন, পদদলিত, ঘৃণিত ও উপেক্ষিত হিন্দু জাতিকে, উপেক্ষিত সনাতন ধর্মকে সর্বধর্মের পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইবে? কে জানিত যে একজন সামান্য বঙ্গীয় যুবক সমুদয় পাশ্চাত্য সভ্যজাতির হৃদয় হইতে হিন্দুধর্মের উপর বহু বর্ষব্যাপী বদ্ধমূল ঘৃণার ভাব একটিমাত্র বক্তৃতা দ্বারা উৎপাটন করিতে সমর্থ হইবে? কে জানিত যে সভ্যজাতীয় অনেকানেক বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ যশস্বী মনীষী জগতের মধ্যে ভীরু ও হেয় জাতির জনৈক স্বল্পবয়স্ক যুবকের নিকট তর্কযুক্তিতে পরাজিত হইবে?' বিস্মিত নরেন। বলে— দাদু তুমি এই যুদ্ধের কথা বলেছিলে? দাদু বলেন— হ্যাঁ, এই যুদ্ধ। এতে সৈন্য সামন্ত-তরবারি- রক্ত কিছুই নেই কিন্তু তাঁর যুক্তির অস্ত্রে সারা বিশ্ব ভারতের কাছে, হিন্দুধর্মের পায়ে নতজানু হয়েছিল। সেদিন সেই যুদ্ধের বীর সেনাপতি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। আর আজ ১১ সেপ্টেম্বর সেই পুণ্য বিশ্ববিজয়ের দিন।

নরেন ও গৌরী একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল— হুর-রে—। শিবনাথবাবু বলেন— এখনও আমার গল্প শেষ হয়নি, আর একটু বাকি আছে। বিশ্ব ধর্মসভায় ১৭ দিনের মধ্যে (১১-২৭ সেপ্টেম্বর) স্বামীজী মোট ১২ টি ভাষণ দিয়েছিলেন। ১৮৯০ থেকে প্রথম সাড়ে তিন বছর পরিব্রাজক রূপে ভারতকে জানা, ১৮৯৩ সালে ধর্মসভায় সেই ভারতকে বিশ্বের কাছে প্রতিষ্ঠা করা এবং ১৮৯৪ থেকে ১৮৯৭ এই ৪ বছর এক 'Cyclonic Hindu of India' হয়ে বিদেশের বহু দেশে সেই প্রতিষ্ঠিত শ্রেষ্ঠ ভারতের কথা প্রচার করে তিনি ১৮৯৭ সালের ১৫ জানুয়ারী ফিরলেন শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোয়। পরের দিন ফ্লোরার হলে রাখলেন তাঁর অমূল্য ভাষণ। কী বিষয়ে? নরেন, তুমি প্রথমে জিজ্ঞাসা করছিলে না— বিবেকানন্দের ভারত কোন ভারত? এই ভাষাতে তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ কী? বললেন— 'যদি এই পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ থাকে, যাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যেতে পারে, এমন কোনো স্থান থাকে যেখানে মানুষের ভেতর ক্ষমা, দয়া, পবিত্রতা, শান্তভাব প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশ সবচেয়ে অধিক পরিমাণে হয়েছে, তবে নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি সে আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ।' অর্থাৎ তাঁর ভারত— পুণ্যভূমি মাতৃভূমি ভারত'। নরেন বলে— পুণ্যভূমি মাতৃভূমি!

শিবনাথবাবু বলেন, —আচ্ছা নরেন যদি আমি মারা যাই, আর যদি ঘুমিয়ে থাকি— আমাকে দেখলে তো একই রকম লাগবে, তাই না? তবে জীবিত আর মৃতের মধ্যে পার্থক্য কী? বলতে পারো? নরেনের ছোট্ট মাথায় উত্তর আসে না, বলে— না বলতে পারবো না। 'পার্থক্য হলো 'ঘুমানো আমি'তে আত্মা আছে, 'মৃত আমি'তে আত্মা নেই। পরাধীন ভারতবর্ষ হাজার বছর এখানেই পড়েছিল, কিন্তু তার ভেতরে আত্মা ছিল না, চলে গিয়েছিল অন্য জায়গায়। যেন ভারতের শরীরটা মৃতবৎ পড়েছিল। স্বামীজী তাঁর সাত বছরের সাধনায় সেই বেরিয়ে যাওয়া আত্মাকে মৃত ভারতের শরীরে ঢুকিয়ে দিলেন সঞ্জীবনী মন্ত্রে, আবার জেগে উঠল দেশটা। তাই এক মহান মনীষী তাঁর ভারত প্রত্যাবর্তনকে ব্যাখ্যা করে লিখেছেন— 'এ কোনো সফল মানুষের দেশে ফেরা নয়, 'ভারতের আত্মা'--- ভারতবর্ষেই যেন ফিরে এল আবার কত যুগ পরে।' এই বছর স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব, সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর বিশ্ববিজয় শেষে দেশে ফেরার অর্থাৎ ভারতে প্রত্যাবর্তনেরও ১২৫তম বর্ষ (১৮৯৭-২০২২)। তোমরা বলো এই শুভবর্ষে আমাদের সকলের করণীয় কী?

নরেন বলে— 'দাদু আমি বলি? তুমি যে সেই গানের লাইনটা বলেছিলে 'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে'— তার জন্য কাজ করতে হবে।' নাতির উত্তরে শিবনাথবাবুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে--- 'correct, my boy. ঠিক বলেছো। আমাদের সেই স্বপ্নই দেখতে হবে। কিন্তু কীভাবে? প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পিজে আব্দুল কালাম আমাদের একটা সুন্দর কথা বলে গেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমরা রাতে ঘুমিয়ে যেটা দেখি সেটা স্বপ্ন নয়। যে আদর্শ, যে প্রতিজ্ঞা, যে শপথ আমাদের রাতের ঘুম কেড়ে নেয় সেটাই স্বপ্ন। আজ সব দেশবাসীকে সেই স্বপ্ন দেখতে হবে।

নরেন দাদুর কথাগুলো যেন গিলতে থাকে। দাদু বলেন, —দেখো আজ থেকে ঠিক ২৫ বছর পরে যখন ভারতের স্বাধীনতার শতবর্ষ পালন হবে তখন যেন আমাদের সকলের চেষ্টায় এই দেশ স্বামীজীর স্বপ্নের ভারত হয়ে উঠতে পারে— যে ভারত বিশ্বগুরু ভারত, যে ভারত আত্মনির্ভর ভারত, যে ভারত শক্তিশালী ভারত, যে ভারত শিক্ষায়-দীক্ষায়, জ্ঞানে-গরিমায়, শিল্পে-সম্পদে, ধর্মে-কর্মে অপ্রতিদ্বন্দ্বী অপ্রতিরোধ্য। সেই ভারতই পুণ্যভূমি বিশ্বজননী ভারত। আর ওই ভারতের যারা বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র, মাতঙ্গিনী, নিবেদিতা— তারা হবে তোমরা— নরেন গৌরীর মতো ছেলে-মেয়েরা। আজকের তরুণ-বালক-শিশুরাই হবে সেই ভারতের চালিকাশক্তি। তখন হয়তো আমি থাকবো না, তোমার বাবা-মাও আমার মতো বৃদ্ধ হয়ে যাবেন। কিন্তু তোমরাই হবে প্রকৃতপক্ষে ভারত ভাগ্যবিধাতা।' এতটা বলে শিবনাথবাবু থামলেন।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে এগারোটার ঘণ্টা বাজল। নরেনের মা বলেন— এবার রান্নাবান্না খাওয়াদাওয়া হোক। সন্ধ্যায় বরং বাবার কাছে আরও কিছু কথা শোনা যাবে। নরেন ও গৌরী আনন্দে দুহাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল— 'দাদু, যুগ যুগ জীও'। □

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার টাকা ব্যবহার না হওয়ায় জরিমানার মুখে পশ্চিমবঙ্গ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কঠিন ও তরল বর্জ্যের ব্যবস্থাপনার উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে না পারায় রাজ্যকে ৩,৫০০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিল জাতীয় পরিবেশ আদালত। আদালতের নির্দেশে তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ৩,০০০ কোটি টাকা এবং কঠিন বর্জ্যের জন্য ৫০০ কোটি টাকা জরিমানা গুনতে হবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে। গত ১ সেপ্টেম্বর বিচারপতি আদর্শকুমার গোয়েল, বিচারপতি সুধীর আগরওয়াল ও বিশেষজ্ঞ সদস্য এ সেন্থিভেলের নেতৃত্বাধীন মুখ্য বেঞ্চ এই নির্দেশ দেয়। অতীতে কোনও রাজ্যকে দূষণের দায়ে এতবড়ো অঙ্কের ক্ষতির মুখে পড়তে হয়নি বলে মত পরিবেশকর্মীদের। পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের প্রাক্তন মুখ্য আইন আধিকারিক তথা পরিবেশকর্মী বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘‘এই খাতে রাজ্য সরকারের যে খরচ করা উচিত ছিল, সেটা সঠিকভাবে করছে না। সেজন্যই আদালত বাধ্যতামূলকভাবে রাজ্য সরকারকে এই খাতে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা খরচ করতে বলেছে। এটাই জরিমানা।’’ তিনি জানান, ‘‘বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন

খাতে টাকা আসছে। সেগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার হচ্ছে না বলেই রাজ্যকে ক্ষতিপূরণ দিতে বলেছে পরিবেশ আদালত। কিন্তু ক্ষতিপূরণের অঙ্কটাও সেই রাজ্য সরকারের হাতেই খরচে করার দায়িত্ব না দিয়ে আদালতের নজরদারিতে একটি কমিটি গড়ে তার হাতে দায়িত্ব দিলে ভালো হতো।’’

পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত এ রাজ্যের কঠিন ও তরল বর্জ্যের দূষণ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আদালতে মামলা করেছিলেন। তিনি জানান, ‘‘আমি এই ধরণের দূষণ নিয়ে অন্তত ২৫টি মামলা করেছি। আদালতের এই ক্ষতিপূরণের নির্দেশ নিশ্চিতভাবেই দৃষ্টান্তমূলক। পরিবেশবিধি মেনে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করাটাও যে রাজ্য সরকারের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, সেটা আদালতের নির্দেশে পরিষ্কার হলো।’’ দেশের প্রায় সব রাজ্যেই কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থা নিয়ে বেশ কয়েক বছর পরিবেশ আদালতে মামলা হয়েছিল। তার মধ্যে ছিল পশ্চিমবঙ্গও। পরবর্তীতে আদালতের নির্দেশে পুর এলাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিধিও তৈরি হয়। সংশ্লিষ্ট পুরসভা, জেলাশাসক-সহ রাজ্যের শীর্ষ আধিকারিকদের সেই বিধি কার্যকরের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু তার পরেও সব জায়গায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকাঠামো তৈরি না হওয়ায় তা নিয়ে বিভিন্ন সময়ের শুনানিতে ক্ষোভ প্রকাশ করে আদালত। দু'মাসের মধ্যে ওই ক্ষতিপূরণের অঙ্ক রিং-ফেন্সড অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে রাজ্যকে।

রাজ্যের মুখ্য সচিবকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তরল ও কঠিন বর্জ্য যাতে কোনওভাবেই মাটিতে বা জলে মিশে পরিবেশের ক্ষতি না করতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেই এই টাকা খরচ করতে হবে। তিন মাসের মধ্যে এই নিয়ে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করতে হবে রাজ্যকে। তবে এরপরেও পরিবেশবিধি লঙ্ঘন চলতে থাকলে আরও বড়ো জরিমানা গুনতে হবে বলে সতর্ক করেছে পরিবেশ আদালত।

পিএফ পরিষেবায় নজরদারি বাড়ছে কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অতীতে প্রভিডেন্ট ফান্ডের গ্রাহক পরিষেবা নিয়ে বার বার অবহেলার অভিযোগ উঠেছে। পিএফ সংক্রান্ত এই সমস্যার সমাধানে এবার নজরদারির উপর বিশেষ জোর দিচ্ছে মোদী সরকার। তা মাথায় রেখেই অ্যাডিশনাল সেন্ট্রাল প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনারদের জন্য ১৬৭ দফা নির্দেশিকা জারি করেছে কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংগঠন (ইপিএফও)। উল্লেখযোগ্যভাবে এক্ষেত্রে সবথেকে বেশি জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ডের (ইপিএফ) পেনশন এবং অ্যাকাউন্টস সংক্রান্ত বিষয়ের উপরেই।

সম্প্রতি এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে ইপিএফও'র তরফে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে যে প্রত্যেক বছর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ইপিএফও'র অ্যাডিশনাল প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনারদের ইন্সপেকশনের কাজ শেষ করতে হবে। এছাড়াও পেনশন পেমেন্ট অর্ডার(পিপিও) ইস্যু হওয়া সত্ত্বেও পেনশন পাননি, এমন ঘটনা খতিয়ে দেখতে হবে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের। ইন্সপেকশনের শুরু থেকে সবথেকে পুরনো এমন পাঁচটি কেস খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে ইপিএইও আধিকারিকদের। একইভাবে ইপিএফ বা ইপিএস অথবা ইডিএলআইয়ের ক্লেমও স্ক্রুটিনি করতে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রেও বেঁধে দেওয়া হয়েছে পাঁচটি কেসের মাপকাঠি।

যাত্রাশুরু প্রথম দেশীয় বিমানবাহী রণতরী বিক্রান্তের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে গত ২ সেপ্টেম্বর তার যাত্রা শুরু করল আইএনএস বিক্রান্ত। এটি হলো সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রযুক্তি ও পরিকাঠামোয় তৈরি প্রথম বিমানবাহী রণতরী।

২৬২ মিটার উঁচু, ৬২ মিটার চওড়া 'বিক্রান্ত' ভারতে তৈরি সবচেয়ে

বড়ো যুদ্ধজাহাজ। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এই রণতরী নির্মাণের কাজ চলেছে। বিক্রান্তের 'সি ট্রায়াল' শুরু হয়েছিল গত বছর আগস্টে। প্রায় এক বছর ধরে ট্রায়াল প্রক্রিয়া চলেছে বিমানবাহী এই রণতরীর। নৌসেনার তরফে ছাড়পত্র পাওয়ার পরই বিক্রান্তকে ভারতের নিরাপত্তায় জলে নামানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন নৌবাহিনীর নতুন পতাকাও উদ্বোধন করা হয়।

বিমানবাহী এই রণতরীতে ১৬০০ ক্রু সদস্যের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে ৩০টি বিমান ওঠানামার বন্দোবস্ত। মিগ ২৯কে'র মতো যুদ্ধবিমান ওঠানামা করার সুবিধা থাকছে বিক্রান্ত-এ। ৪৫ হাজার টনের এই যুদ্ধজাহাজ তৈরিতে খরচ হয়েছে ২০ হাজার কোটি টাকা। এর আগে ভারতের হাতে একমাত্র বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজ হিসেবে ছিল 'আইএনএস বিক্রমাদিত্য'। এই যুদ্ধজাহাজ আমদানি করা হয়েছিল রাশিয়া থেকে ২০১৪ সালে। আইএনএস বিক্রান্ত হাতে পাওয়ার পর আমেরিকা, ব্রিটেন, রাশিয়া, ফ্রান্সের মতো দেশের সঙ্গে একই তালিকায় ঢুকে পড়ল ভারত, যারা বিমানবাহী রণতরী তৈরি করেছে।

ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের নতুন সভাপতি কল্যাণ চৌবে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের নতুন সভাপতি নির্বাচিত হলেন দেশের প্রাক্তন ফুটবলার কল্যাণ চৌবে। নির্বাচনে প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবল অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়াকে হারিয়ে সর্বভারতীয় সভাপতি হন তিনি। এই প্রথমবার ভারতীয় ফুটবলের সর্বোচ্চ পদে বসলেন কোনও ফুটবলার।

দীর্ঘদিন ধরে আটকে ছিল ফেডারেশনের নির্বাচন। এতদিন তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপে চলছিল ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। যার জেরে ফিফা ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের ওপর অনির্দিষ্টকালের জন্য শর্তসাপেক্ষ নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ফলে অনিশ্চিত হয়ে যায় ভারতে অনুর্ধ্ব ১৭ মহিলা বিশ্বকাপের আয়োজন। শেষপর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে জটিলতা কাটে। নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সভাপতি হলেন কল্যাণ চৌবে।

স্কুলে পড়ার ফাঁকে এবার হবে গানের লড়াই কুমিরডাঙ্গা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কুমিরডাঙ্গা, এক্কা-দোক্কা, গুলিডান্ডা, ঘুড়ি ওড়ানো, গানের লড়াই— ছেলেবেলার সেই খেলাগুলো এবার ফিরতে চলেছে স্কুলের চৌহদ্দিতে। ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতিতে এবার এই সমস্ত খেলাগুলোকে স্কুলে অন্তর্ভুক্ত করার ওপর জোর দিচ্ছে কেন্দ্র সরকার। জাতীয় শিক্ষানীতির দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে ভারতীয় খেলাকে একেবারে স্কুলস্তরে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের বৈঠকের পর যে মিনিটস্ প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে দেশীয় খেলা প্রসারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই দায়িত্ব নিতে হবে স্কুলের পিটি টিচারদের। তদারকি করবে সর্বভারতীয় বোর্ডগুলি। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক সূত্রে খবর, প্রায় ৭৫টি দেশীয় খেলাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে এক্কা দোক্কা, লক অ্যান্ড কি, চু-কিত-কিত, হা-ডু-ডু, ইকির-মিকির জাতীয় খেলা।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে অলিম্পিক অনুমোদিত খেলাধুলোয় এগিয়ে যাচ্ছেন ভারতীয়রা। ভারোত্তলন, কুস্তি, আর্চারির মতো খেলাকে স্কুলস্তর থেকে আনা গেলে ভবিষ্যতে অচিন্ত্য শিউলির মতো আরও অনেক তারকা উঠে আসতে পারবে। এক স্কুলশিক্ষকের কথায়, মোবাইল এসে পড়ুয়াদের মন ও মানসিকতাকে একেবারে বদলে দিয়েছে। তারা ঘরকুনো হয়ে গেছে। ভিডিয়ো গেমই তাদের প্রথম পছন্দ। শরীর আর মন ঠিক রাখতে পড়ুয়াদের খেলাধুলো করাতেই হবে। সর্বত্র ক্রিকেট বা ফুটবল খেলার মতো পরিকাঠামো থাকে না। সেক্ষেত্রে স্বল্প আয়োজনে দেশীয় খেলার তোড়জোড় সহজেই করা যায়। স্কুলস্তরে এমন উদ্যোগ নেওয়া হলে সেই খেলাগুলি হারিয়েও যাবে না।

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪২৯

আগামী সংখ্যাই পূজা সংখ্যা

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

দেবী প্রসঙ্গ

স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ

উপন্যাস

প্রবাল - বায়ু বহে পূর্ব সমুদ্র হতে ● **এষা দে** - একটি কাল্পনিক কাহিনি
সুমিত্রা ঘোষ- স্বপ্ন ধরার জন্য

জীবনের কথা

বিজয় আঢ্য

পুরাণ

ড. জয়ন্ত কুশারী

বড়ো গল্প

সন্দীপ চক্রবর্তী - বাঁধন

গল্প

শেখর সেনগুপ্ত, দীপ্তাস্য যশ, নিখিল চিত্রকর, সিদ্ধার্থ সিংহ

প্রবন্ধ

রঙ্গাহরি, নন্দলাল ভট্টাচার্য, প্রবীর আচার্য, সুজিত রায়,
সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুজিত ঘোষ

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা

।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।। ১৪।।

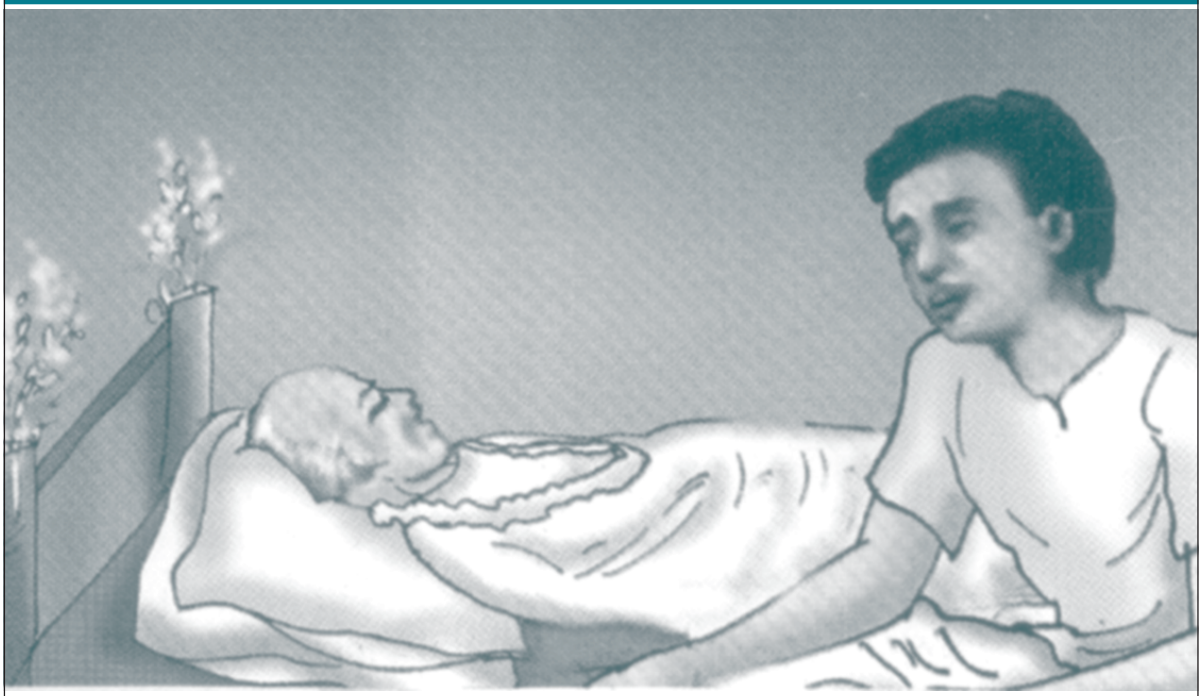

১৩২৫ সনের কার্তিক মাসে বাবা মারা গেলেন। এবার কোনো বাধা রইল না। বঙ্কিম ছুটে এলেন মহেন্দ্রজীর কাছে। জানালেন তাঁর মনের কথা। তিনি সংসার ত্যাগ করতে চান। মহেন্দ্রজী রাজি হলেন না। বললেন, ম্যাট্রিক পাশ না করে তুমি সাধু হতে পারবে না।

আবার ফিলে এলেন বঙ্কিম মা'র কাছে। পরীক্ষার তখন চার-পাঁচ মাস বাকি। চলতে লাগল দিনরাত পড়াশোনা।

(ক্রমশ)